৭। বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়) :
ক) ভূমি :
খ) দালানকোঠা
গ) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি :
ঘ) অন্যান্য নির্ধারিত ব্যয় :

....

মোট টাকা

(ভূমি ও দালানকোঠার মালিকানা বা ভাড়ার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে)

৮। উৎপাদনযোগ্য পণ্যের নাম : বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী) আনুমানিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)

৯। কাঁচামালের ও মোড়ক বাঁধাই উপকরণের বার্ষিক চাহিদা :
কাঁচামালের বিবরণ : পরিমাণ মূল্য (লক্ষ টাকায়)
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য :

মোট মূল্য টাকা ....

১০। যন্ত্রাংশের বার্ষিক চাহিদা :
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য :

১১। যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির বিবরণ : ইতোমধ্যে সংগৃহীত মূল্য (লক্ষ টাকায়)
ক) স্থানীয় :
খ) আমদানিযোগ্য : সংগৃহীতব্য

বৈদেশিক মুদ্রা সমপরিমাণ টাকা (লক্ষ টাকায়)

....

ঋণপত্র খোলা হয়েছে :
আমদানি করা হবে :

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি হলে ঋণপত্র (এল,সি), ইনভয়েস এর অনুলিপি দাখিল করতে হবে।
(আ) অর্থ যোগানের উৎস (ওয়েজ আর্নার স্কীম/সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/পে-অর্ডার অন্যান্য উল্লেখ করতে হবে।
(ই) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি হলে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের রসিদ/ চুক্তিনামার অনুলিপি দাখিল করতে হবে।

১২। নিয়োজিত/নিয়োগযোগ্য কর্মচারি সংখ্যা :-
১৩। প্রকৃত বিদ্যুৎ জ্বালানি চাহিদা (কিলোওয়াট) :-
১৪। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ :-

স্বত্বাধিকারী / ব্যবস্থাপনা অংশীদার

শ্রম আইন

শ্রম আইনের সংজ্ঞা : শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের কাজের শর্ত ও অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা বা মালিকের সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে, তাকেই শ্রম আইন বলা হয়।

শ্রম আইনের পটভূমিকা

বাংলাদেশে শ্রম ও শিল্প আইনের উৎপত্তিকে আমরা নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা করতে পারি :

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায় : ১৮৮১ সালের পূর্বে বঙ্গ–ভারত উপমহাদেশে, কোনো সংগঠিত শিল্প আইন ছিল না। তখনকার দিনের শিল্প আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা। সে সময় এ উপমহাদেশে সংগঠিত শিল্পের মধ্যে চা–বাগান, খনিজ এবং কাগজের মিলগুলোই ছিল প্রধান এবং শিল্প আইনগুলো কেবলমাত্র ঐ সকল শিল্প–কারখানার জন্য প্রযোজ্য ছিল। এ দেশে ১৮৬৩ হতে ১৯০১ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শিল্প–আইন প্রবর্তিত হয়। এ সকল শিল্প–আইনে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অনেকটা কেনা গোলামের মত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্বের প্রবর্তিত অনেক শিল্প–আইনকে সংশোধন করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯১১ সালে ‘কারখানা আইন’ (Factory Act) নামক একটি শিল্প–আইন আইন পরিষদে পাস করিয়ে নেয়া হয়। এ আইন মোতাবেক বস্ত্র শিল্পে (Textile) পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক কার্যসীমা ১২ ঘণ্টা, নারী ও শিশু শ্রমিকদের বেলায় দৈনিক ৬ ঘণ্টা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া, কারখানার বিপজ্জনক অংশে নারী এবং শিশু শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ হতে বিরত রাখতে এবং বিকাল ৭টা হতে সকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত কোনো কোনো শিল্পে কাজ করা হতে বিরত থাকার ব্যবস্থা এ আইনে ছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রম সম্পর্কিত ২৫টি আইন রহিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে।

শ্রম আইনের আওতা

বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের কার্য, পরিবেশ এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক শ্রম ও শিল্প আইন প্রবর্তিত হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে উত্তম ও প্রীতিকর সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ও শাস্তি বিধান, নিয়োগকর্তাদের নিজেদের মধ্যে অথবা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে অথবা শ্রমিকদের নিজের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শ্রম আইনের আওতাভুক্ত। এ সকল বিষয়ে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়েরই সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শ্রম আইন পাঠের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ ও নিয়োগকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে যথাবিহীত সজাগ থাকার প্রয়াস পায়।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টই বলা যায়, আইন পাঠের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শ্রম আইন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা প্রত্যেক উদ্যোক্তার জন্যই জরুরি। কেননা শ্রম আইন একটি বিশেষ ধরনের আইন যা কোনো দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য।

শ্রম আইন কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল ব্যক্তিদের মালিক অথবা শ্রমিক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এ আইনে শ্রমিক অর্থ কোনো দোকান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, দৈহিক, কারিগরি, বাণিজ্য সংক্রান্ত বা কেরানিগিরি ধরনের কাজ করার জন্য মজুরি প্রদানের ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়, তার চাকরির শর্ত ব্যক্ত বা অব্যক্ত যেমনই হোক না কেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এর আওতায় পড়বে না।

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান শ্রম আইনগুলো প্রচলিত ছিল :

১. কারখানা আইন, ১৯৬৫

২. দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৬৫

৩. শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ), ১৯৬৫

৪. শ্রমিক সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯

৫. মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬
৬. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩
৭. বাংলাদেশে মাতৃত্ব কল্যাণ আইন, ১৯৩৯

বর্তমানে উল্লিখিত আইনগুলোসহ মোট ২৫টি আইন রহিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে নিম্নে কারখানা, শ্রমিক, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও মৌসুমী কারখানা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

কারখানা আইন

১। **কারখানা (Factory) :** "কারখানা" অর্থ এমন কোনো ঘর-বাড়ি বা আঙ্গিনা যেখানে বৎসরে কোনো দিন সাধারণত: পাঁচ জন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন এবং উহার যে কোনো অংশে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে, কিন্তু কোনো খনি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে না। [২ (৭ ধারা]

২। **শ্রমিক (Worker) :** "শ্রমিক" অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, তার চাকুরির শর্তাবলী প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরী, ব্যবসায় উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত: প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামুলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [২(৬৫) ধারা]

৩। **উৎপাদন প্রক্রিয়া** "উৎপাদন প্রক্রিয়া" অর্থ নিম্নোক্ত যে কোনো প্রক্রিয়াকে বুঝাবে যথা–

ক) কোনো বস্তু বা পদার্থের ব্যবহার, বিক্রয়, পরিবহণ, বিতরণ, প্রদর্শন বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত, পরিবর্তন, মেরামত, অলংকরণ, রংকরণ, ধৌতকরণ, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ, গাঁট বা মোড়কবন্দীকরণ অথবা অন্য কোনোভাবে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় আরোপকরণ

খ) তৈল, গ্যাস, পানি, নর্দমার ময়লা অথবা অন্য কোনো তরল আবর্জনা পাম্প করার প্রক্রিয়া

গ) শক্তি বা গ্যাস উৎপাদন, হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ বা প্রেরণ প্রক্রিয়া

ঘ) জাহাজ বা নৌ-যান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত, সম্পূর্ণ বা নিখুঁতকরণ বা ভাঙ্গানের প্রক্রিয়া

ঙ) লেটার প্রেস, লিথোগ্রাফি, ফটোগ্রেভোর, কম্পিউটার, ফটো কম্পোজ, অফসেট অথবা অনুরূপ কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ছাপার কাজ অথবা বই-বাঁধাই এর প্রক্রিয়া যা ব্যবসায় হিসাবে অথবা মুনাফার জন্য অথবা অন্য কোনো ব্যবসার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে পরিচালিত হয়।

৪। **মৌসুমী কারখানা** : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৩২৮ ধারায় মৌসুমী কারখানার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে– সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো বৎসরে সাধারণত: একশত আশি কর্মদিবসের অধিক কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু থাকে না এবং কেবল মাত্র কোনো বিশেষ মৌসুম ছাড়া অন্য কোনো সময় অথবা প্রাকৃতিক শক্তির অনিয়মিত ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া চালু রাখা যায় না এরূপ কোনো কারখানাকে, এ আইনের উদ্দেশ্যে মৌসুমী কারখানা বলে ঘোষণা করতে পারবে।

প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শক

এ আইনের উদ্দেশ্যে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা একজন প্রধান পরিদর্শক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপ-প্রধান পরিদর্শক, সহকারী প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক নিযুক্ত করে এ আইনের অধীনে তাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্র বা এলাকা বা এখতিয়ারাধীন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

প্রধান পরিদর্শকের এ আইনের অধীন তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও সমগ্র দেশে একজন পরিদর্শকের ক্ষমতা থাকবে। এছাড়াও প্রধান পরিদর্শকের সকল উপ-প্রধান পরিদর্শক, সহকরীপ্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শকের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে।

প্রধান পরিদর্শক, লিখিত–সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা তাঁর কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কোনো উপ–প্রধান পরিদর্শক, সহকারী প্রধান পরিদর্শক বা পরিদর্শকের উপর অর্পণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, এর ১১৪ ধারায় দোকান বা বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

দোকান, ইত্যাদি বন্ধ

(১) প্রত্যেক দোকান বা বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতি সপ্তাহে অন্তত: দেড় দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

(২) কোনো এলাকায় উক্তরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কোন দেড় দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে তা প্রধান পরিদর্শক স্থির করে দিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক সময় সময় জনস্বার্থে উক্তরূপ নির্ধারিত দিন কোনো এলাকার জন্য পুন:নির্ধারিত করতে পারবেন।

(৩) কোনো দোকান, কোনো দিন রাত্রি আট ঘটিকার পর খোলা রাখা যাবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো গ্রাহক যদি উক্ত সময়ে কেনা–কাটার জন্য দোকানে থাকেন তা হলে উক্ত সময়ের অব্যবহিত আধাঘণ্টা পর পর্যন্ত উক্ত গ্রাহককে কেনা কাটার সুযোগ দেওয়া যাবে।

(৪) সরকার, বিশেষ অবস্থা বিবেচনায়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো মৌসুমে নোটিশে উল্লিখিত শর্তে কোনো এলাকার দোকানের বন্ধের সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

তবে এ ধারার বিধানাবলী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যথা :

(ক) ডক, জেটি, স্টেশন অথবা বিমান বন্দর এবং পরিবহন সার্ভিস টার্মিনাল অফিস;

(খ) প্রধানত: তরি-তরকারি, মাংস, মাছ, দুগ্ধ জাতীয় সামগ্রী, রুটি, পেস্ট্রি, মিস্টি এবং ফুল বিক্রির দোকান

(গ) প্রধানত: ঔষধ, অপারেশন সরঞ্জাম, ব্যান্ডেজ অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান

(ঘ) দাফন ও অন্ত্যেস্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রির দোকান

(ঙ) প্রধানত: তামাক, সিগার, সিগারেট, পান–বিড়ি, বরফ, খবরের কাগজ, সাময়িকী বিক্রির দোকান এবং দোকানে বসে খাওয়ার জন্য তরল নাশতা বিক্রির খুচরা দোকান

(চ) খুচরা পেট্রোল বিক্রির জন্য পেট্রোল পাম্প এবং মেরামত কারখানা নয় এমন মোটর গাড়ীর সার্ভিস স্টেশন

(ছ) নাপিত এবং কেশ প্রসাধনীর দোকান

(জ) যে কোনো ময়লা নিষ্কাশন অথবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

(ঝ) যে কোনো শিল্প, ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান যা জনগণকে শক্তি, আলো–অথবা পানি সরবরাহ করে

(ঞ) ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, খাবার দোকান, সিনেমা অথবা থিয়েটার।

তবে শর্ত থাকে যে, একই দোকানে অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে যদি একাধিক ব্যবসায়–বাণিজ্য পরিচালিত হয় এবং উহাদের অধিকাংশ তাদের প্রকৃতির কারণে এ ধারার অধীন অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য হয় তা হলে সমগ্র দোকান বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে উক্তরূপ অব্যাহতি প্রযোজ্য হবে।

আরো শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান শ্রেণীর জন্য উহার খোলা ও বন্ধের সময় স্থির করে দিতে পারবেন।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা, ওভারটাইম ও মজুরি

১। **কার্যঘণ্টা :** কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে কোনো প্রতিষ্ঠানে সাধারণত: এ আইনের উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করানো যাবে না।

২। সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা : কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে কোনো প্রতিষ্ঠানে এ আইনের উদ্দেশ্যে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত: সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার অধিক সময় কাজ করানো যাবে না।

৩। ওভারটাইম : কোনো শ্রমিককে ওভারটাইম কাজ করতে বলা যেতে পারে তবে ওভারটাইমসহ সপ্তাহে কর্মঘণ্টা ৬০ ঘন্টার বেশি হবে না এবং কোনো বৎসরে উহা গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টার অধিক হবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো সড়ক পরিবহণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো শ্রমিকের সর্বমোট অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা বৎসরে ১৫০ ঘণ্টার অধিক হবে না।

৪। অতিরিক্ত মজুরি : ওভার টাইমের মজুরির হার সাধারণ মজুরির হারের দ্বিগুণ হবে।

৫। বিশ্রাম : কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক–

ক) দৈনিক ৬ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে বিশ্রাম বা আহারের জন্য ১ ঘণ্টা বিরতি দেওয়া হয়।

খ) দৈনিক ৫ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে ১/২ ঘণ্টা বিরতি দেওয়া হয়।

গ) দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ করতে বাধ্য থাকবে না, যদি না উক্ত দিনে তাকে দফা (ক) এর অধীন একটি বিরতি অথবা দফা (খ) এর অধীন দুটি বিরতি দেওয়া হয়।

৬। মজুরি পরিশোধের সময় : কোনো শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি তাহার মজুরিকাল শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

যে ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের চাকরি যে কোনো কারণে অবসান হয় সে ক্ষেত্রে চাকরি অবসানের তারিখ হতে পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মজুরি পরিশোধ করতে হবে এবং সকল মজুরি কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৭। উৎসব ছুটি : প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে ১১ দিনের মজুরিসহ উৎসব ছুটি পাবেন। তবে বিধি দ্বারা নির্ধারিতভাবে মালিক উক্ত ছুটির দিন ও তারিখ স্থির করবেন।

কোনো শ্রমিককে দিয়ে উৎসব ছুটিতে কাজ করাতে হলে তাকে ২ দিনের মজুরিসহ ক্ষতিপূরণ ছুটি এবং একটি বিকল্প ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

৮। নৈমিত্তিক ছুটি : একজন শ্রমিক একটি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাবার অধিকারী হবেন। ভোগ না করলে নৈমিত্তিক ছুটি জমা থাকে না। তাছাড়াও এক বৎসরের ছুটি অন্য বৎসরে ভোগ করা যাবে না।

৯। অসুস্থতার জন্য ছুটি : সংবাদপত্র শ্রমিক ব্যতিত প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরিতে ১৪ দিনের ছুটি পাবেন। প্রত্যেক সংবাদপত্র শ্রমিক তার চাকরির মেয়াদের অন্যূন এক-অষ্টাদশ অংশ সময় অর্ধ মজুরিতে অসুস্থতা ছুটি পাবার অধিকারী হবেন।

এরূপ ছুটি জমা থাকবে না এবং এক বৎসরে ভোগ না করলে পরবর্তী বৎসরে উহা ভোগ করা যাবে না।

১০। মহিলা শ্রমিকের জন্য সীমিত কর্মঘন্টা : কোনো মহিলা শ্রমিককে তার বিনা অনুমতিতে কোনো প্রতিষ্ঠানে রাত দশ ঘটিকা হতে ভোর ছয় ঘটিকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না।

১১। সমকাজের জন্য সম-মজুরি প্রদান : কোনো শ্রমিকের জন্য কোনো মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরির হার স্থিরকরণের ক্ষেত্রে একই প্রকৃতির বা একই মান বা মূল্যের কাজের জন্য মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকগণের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নারী–পুরুষ ভেদের কারণে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

শ্রমিক নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী :

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের নিয়োগ ও তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি অত্র আইনের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকরি বিধি থাকতে পারে যদি তা কোনো শ্রমিকের জন্য এ আইনের কোনো বিধান হতে কম অনুকূল না হয়।

তবে এরূপ চাকরি বিধি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদন থাকতে হবে। প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতিত কোনো চাকরি বিধি কার্যকর করা যাবে না।

এরূপ অনুমোদনের কোনো বিধান সরকারের মালিকানাধীন, ব্যবস্থাপনাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগ

কাজের ধরন ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

ক) শিক্ষানবীশ
খ) বদলী
গ) অস্থায়ী
ঘ) সাময়িক
চ) স্থায়ী

চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ

এ আইনে লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ এবং চাকরির অবসান সম্পর্কে অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাক না কেন, কোনো শ্রমিককে বিনা নোটিশে বা নোটিশের পরিবর্তে বিনা মজুরিতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে, যদি তিনি–

ক) কোনো ফৌজদারী অপরাধের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত হন
খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন

তবে অসদাচারণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোনো শ্রমিককে চাকুরি হতে বরখাস্তের পরিবর্তে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে :

ক) অপসারণ
খ) নিচের পদে, গ্রেডে বা বেতন স্কেলে অনধিক ১ বৎসর নামিয়ে দেয়া
গ) অনধিক এক বৎসরের জন্য পদোন্নতি বন্ধ
ঘ) অনধিক এক বৎসরের জন্য মুজুরি বৃদ্ধি বন্ধ
ঙ) জরিমানা
চ) অনধিক ৭ দিন পর্যন্ত বিনা মজুরিতে বা বিনা খোরাকীতে সাময়িক বরখাস্ত
ছ) ভৎসনা ও সতর্কীকরণ

শাস্তি দানের পদ্ধতি

কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ প্রদান করার পূর্বে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

ক) অভিযোগ লিখিতভাবে করতে হবে
খ) অভিযোগের একটি কপি শ্রমিককে দিতে হবে এবং জবাব দেওয়ার জন্য অন্তত: ৭ দিন সময় দিতে হবে।
গ) অভিযুক্ত শ্রমিককে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।
ঘ) তদন্তের পর তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।
ঙ) মালিক বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বরখাস্তের আদেশ অনুমোদন করতে হবে।

পণ্য প্রতীক নিবন্ধীকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করতে চাইলে বা সে বিশেষ পণ্যটিকে বাজারে প্রচলিত অনুরূপ অন্যান্য পণ্য থেকে আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে প্রয়োজনবোধে সে পণ্যের প্রতীক (ট্রেড মার্ক) রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধীকরণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বি.এস.টি.আই (১১৬–ক,

তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮) পণ্যের প্রতীক নিবন্ধীকরণের দায়িত্ব পালন করে। নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় ফী জমা দিয়ে পণ্য প্রতীক বা ট্রেড মার্ক নিবন্ধীকরণ করা যেতে পারে। তদুপরি কতিপয় নির্ধারিত পণ্যের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত মান অনুযায়ী সে সকল পণ্য উৎপাদন করে বি.এস.টি.আই থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সনদপত্র বা সার্টিফিকেট নিতে হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে সার্টিফিকেশন এর আওতাধীন পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করে। নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বি.এস.টি.আই কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেশন বা লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। কোনো কোনো পণ্য বি.এস.টি.আই এর বাধ্যতামূলক সার্টিফিকেশন মার্ক এর আওতাধীন এবং সে সকল পণ্যের নির্ধারিত মান বি.এস.টি.আই থেকে জানা যাবে। উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বি.এস.টি.আই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

ব্যাংক

যে সকল প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণ নিয়ে ব্যবসায় করে তাদেরকে ব্যাংক বলে। ব্যাংকের প্রধান কাজ হল জনসাধারণের সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে একত্রিত করা এবং সে অর্থ বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ হিসেবে প্রদান করা।

যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তারা ব্যাংক থেকে সুদ পায় এবং যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তারা ব্যাংককে সুদ দেয়। এ দুই সুদের পার্থক্যই হল ব্যাংকের মুনাফা এবং এর উপরেই ব্যাংকের ব্যবসায় টিকে থাকে। তাই বলা যায় যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমাজের এক শ্রেণীর লোকের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা অপর শ্রেণীর লোককে সুদের পরিবর্তে ধার দেয় তাকেই ব্যাংক বলা হয়।

ব্যাংকের প্রকারভেদ

ব্যাংকের গঠন ও কাজের প্রকৃতি অনুসারে এদেরকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক : পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা ব্যবসায় ও ব্যাংক ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক : বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রধানত স্বল্প মেয়াদি ঋণ নিয়ে কারবার করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের অর্থ আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ দান করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন কাজে সহায়তা করে। সোনালী ব্যাংক এ ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদাহরণ।

৩. শিল্প ব্যাংক : বিভিন্ন শিল্প সংস্থাসমূহে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প ব্যাংক গঠিত হয়। 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক' এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ।

৪. কৃষি ব্যাংক : কৃষিক্ষেত্রে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দানের উদ্দেশ্যে কৃষি ব্যাংক গঠিত হয়। 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' এ ধরনের ব্যাংকের উদাহরণ।

৫. সমবায় ব্যাংক : এগুলো সমবায় পদ্ধতিতে গঠিত ব্যাংক। সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দান করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। এ সমস্ত ব্যাংক দরিদ্র কৃষক ও কুটির শিল্প মালিকদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে।

৬. বিনিময় ব্যাংক : বিনিময় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে ব্যবসায় করে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করাই এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

দেশের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলিকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-(ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি (খ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি এবং (গ) সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলি।

নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল :

ক. সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি : বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নোক্ত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে :

১. আমানত গ্রহণ করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানতের আকারে একত্রিত করা। **আমানত তিন প্রকারের হতে পারে :** (ক) চলতি আমানত (খ) সঞ্চয়ী আমানত এবং (গ) স্থায়ী আমানত। চলতি আমানত থেকে ইচ্ছানুযায়ী টাকা উঠান চলে। কিন্তু সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত থেকে টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা নিষেধ থাকে। চলতি আমানতের জন্য ব্যাংক কোনো রকম সুদ দেয় না। তবে সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাংক সুদ প্রদান করে।

২. ঋণ দান করা : জনসাধারণের নিকট থেকে আমানতরূপে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ব্যাংক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থাগুলোকে ঋণ দেয় এবং সেখান থেকে সুদরূপে আয় উপার্জন করে। ব্যাংক নানাভাবে ঋণদান করে। **প্রথমত,** ব্যাংক সরাসরি নগদ টাকায় ঋণ দিতে পারে। **দ্বিতীয়ত,** ব্যাংক আমানতকারীকে জমা অপেক্ষা অধিক টাকা তোলার সুবিধা দিতে পারে। **তৃতীয়ত,** ব্যাংক বিল বাট্টা করতে পারে। ব্যাংক আমানতকারীকে যে সুদ দেয় এবং ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে যে সুদ পায়–এ দুইয়ের পার্থক্যই হল ব্যাংকের আয়। ব্যাংক সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তির জামিনে ঋণ প্রদান করে।

৩. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করা : চেকের মাধ্যমে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা প্রেরণ করে।

খ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি : ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে ব্যাংক শেয়ার ক্রয় করে। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ভালোরূপে ওয়াকেফহাল থাকে বলে ব্যাংক এ কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

২. ব্যাংক মক্কেলদের প্রতিনিধিরূপে বীমা প্রিমিয়াম দেয়, আয়করের হিসাব দাখিল করে এবং পেনশনের টাকা, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, মূলধনের সুদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

৩. ব্যাংক অনেক সময় বিল ক্রয় করে এবং তা ভাঙিয়ে বাট্টা আদায় করে।

৪. ব্যাংক মক্কেলদের হিসাবপত্র রক্ষা করে এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৫. ব্যাংক মক্কেলদের অছি (Trustee) রূপে তাদের বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করে।

গ. সাধারণ সুবিধামূলক কার্যাবলি : প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি ছাড়াও ব্যাংক মক্কেলদের সাধারণ সুবিধা ও নিরাপত্তামূলক সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে কতিপয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। এগুলো নিম্নরূপ :

১. ব্যাংক দলিলপত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

২. ব্যাংক মক্কেলদের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়ের সুনাম সম্বন্ধে সার্টিফিকেট প্রদান করে।

৩. ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেন নিষ্পত্তি করে থাকে।

৪. ব্যাংক আমদানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঋণপত্র প্রদান করে।

৫. দূর দেশে ভ্রমণকারীদের জন্য ব্যাংক এক বিশেষ ধরনের চেক ব্যবহার করতে দেয়। এটি ভ্রমণকারীদের চেক (Traveller's Cheque) নামে পরিচিত। এটি ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ সহায়ক।

৬. আমানতকারীদের অনুরোধে ব্যাংক তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৭. ব্যাংক সরকার, জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির ঋণ অবলিখন (Under writing) করে থাকে।

বীমা (Insurance)

বর্তমান যুগে ব্যবসায়ীগণ বহুবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক স্তরেই কিছু–না–কিছু ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন, জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি, চুরির ঝুঁকি, অগ্নি, নৌ, রেল অথবা মোটর দুর্ঘটনা, অপহরণ প্রভৃতি কারণে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এসব ঝুঁকিজনিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির একটি প্রধান উপায় বীমা।

যে চুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো ঘটনাজনিত ক্ষতির বা ঘটনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বীমা বলে। উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বা নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের জন্য যে পক্ষ স্বীকৃত হয় তাকে বীমাকারী এবং যার ক্ষতিপূরণের জন্য বা যাকে অর্থ প্রদানের জন্য উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে বীমা গ্রহীতা বলে। বীমাচুক্তি যে দলিল দ্বারা সম্পাদিত হয় তাকে বীমাপত্র বলা হয়।

ব্যবসার সহায়ক হিসেবে বীমা

একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ঝুঁকি নিরূপণ বা অনুধাবন। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের বহুবিধ ঝুঁকি বিদ্যমান। যেমন, কোনো জিনিসের ভৌতিক ক্ষতি, চুরি, কর্মচারীদের পীড়া, আকস্মিক দুর্ঘটনা, আগুন, জাহাজডুবি প্রভৃতি ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বীমা সংস্থা বীমাকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিমাফিক প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এ জাতীয় ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ব্যবসার জন্য তাই বীমা অত্যন্ত সহায়ক। বীমা সংস্থা না থাকলে ঝুঁকির আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ীকেই প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে হতো।

বীমার প্রকারভেদ

বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বীমার প্রচলন হয়েছে। এর মধ্যে চার প্রকার বীমা সর্বাধিক প্রচলিত।

১. জীবন বীমা ২. নৌ–বীমা ৩. অগ্নিবীমা এবং ৪. দুর্ঘটনা বীমা।

বর্তমানকালে মানুষ ক্রমশই বীমার সুবিধা উপলব্ধি করায় উপরিউক্ত চার প্রকার বীমা ছাড়াও আরও কয়েক শ্রেণীর বীমার প্রচলন হয়েছে। যেমন: চৌর্য বীমা, বিশ্বস্ততা বীমা, দাঙ্গা বীমা, দায়বীমা, মোটরগাড়ী বীমা, শস্য বীমা ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বীমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

জীবন বীমা

যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমাকারী বীমা কিস্তির বিনিময়ে বীমা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বা তার নির্বাচিত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে একটি বিশেষ সময়ের পরে বা বীমা গ্রহীতার মৃত্যুতে বীমাকৃত অর্থ প্রদান করে থাকে সে বীমা চুক্তিকেই জীবন বীমা বলে।

অগ্নিবীমা

যে বীমা চুক্তির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা ব্যক্তিকে অগ্নিজনিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দান করা হয় তাকে অগ্নিবীমা বলে।

নৌ–বীমা

যে বীমায় সামুদ্রিক যাত্রা থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে নৌ–বীমা বলা হয়।

দুর্ঘটনা বীমা

ব্যক্তির জীবন বা সম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকি দুর্ঘটনা বীমার আওতাভুক্ত। এ জাতীয় বীমার শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের পরিবর্তে আশঙ্কিত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি সংঘটিত হলে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত কয়টি আইন রহিত করা হয়েছে?

ক. ৭টি
খ. ১০টি
গ. ১৫টি
ঘ. ২৫টি

২. কাজের ধরণ ও প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত শ্রমিকগণকে ভাগ করা যায়–

ক. ২ ভাগে
খ. ৪ ভাগে
গ. ৬ ভাগে
ঘ. ৮ ভাগে

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হচ্ছে –

i. ঋণদান
ii. নির্দেশনা দান
iii. মুদ্রা প্রচলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i ও ii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

সালমা বেগম অগ্রণী ব্যাংক লি: থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করেন। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদে ঋণ গ্রহণ করলেও নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তা পরিশোধ করতে সক্ষম হন।

৪. গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যাংককে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি

৫. অগ্রণী ব্যাংক লি. কোন ধরনের ব্যাংক ?

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. শিল্প ব্যাংক
ঘ. সমবায় ব্যাংক

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিলুফা ইয়াসমিন শাপলা গার্মেন্টস লি.–এ চাকরি করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন কিন্তু মজুরি পান খুবই কম। এমনকি তাকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করতে হয় কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী বাড়তি মজুরি পান না। তার সুপারভাইজার মাঝে মাঝে তাকে বকাঝকা এবং খারাপ আচরণ করেন। এইসব কারণে কারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই।

ক. নিলুফা ইয়াসমিনের মতো নির্যাতিত শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কী?

খ. অতিরিক্ত মজুরি বলতে কী বুঝ?

গ. শাপলা গার্মেন্টস লি.–এর মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকার কারণ কী?

ঘ. যদি শাপলা গার্মেন্টস লি.–এর মালিক পক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে কী কী সুবিধা ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে? ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় ৭

ব্যবসায় পরিকল্পনা

অধ্যায় সূচি

১. ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক
২. ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়
৩. প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য
৪. প্রকল্প সম্প্রসারণ (কেইস/ ইতিবৃত্ত)

পরিকল্পনার প্রকৃতি : সাধারণ কথায় পরিকল্পনা বলতে ভবিষ্যতে কী করতে হবে তা আগে থেকেই ভেবেচিন্তে ঠিক করাকে বুঝায়। পরিকল্পনার অর্থ হল লক্ষ্য ঠিক করা এবং তা অর্জনের সব চেয়ে ভালো পথ খুঁজে বের করা। একটি ভালো পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক সম্পন্ন করার সমান। এখানে ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে বুঝান হচ্ছে, ভবিষ্যতে যে ব্যবসায় করা হবে তার প্রকৃতি, পণ্য/সেবা কতটুকু এবং কীভাবে উৎপাদন এবং বাজারজাত করা হবে, এর ব্যবস্থাপনার ধরন, প্রাথমিক অর্থসংস্থান এবং লাভ-ক্ষতি কী হবে ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য আজকের সিদ্ধান্তসমূহের সংকলন। সঠিক তথ্য নির্ভর এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরই ভবিষ্যত ব্যবসায়ের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক

ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবসায়ের চারটি প্রধান দিক যথাক্রমে, বিপণন, উৎপাদন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বিনিয়োগ সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। নিচে ছকের মাধ্যমে পরিকল্পনার প্রধান চারটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।
প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।
এ উপযোগ প্রধানত তিন ভাগে সৃষ্টি করা হয়।

ব্যবসায় পরিকল্পনার চারটি দিকের ছক

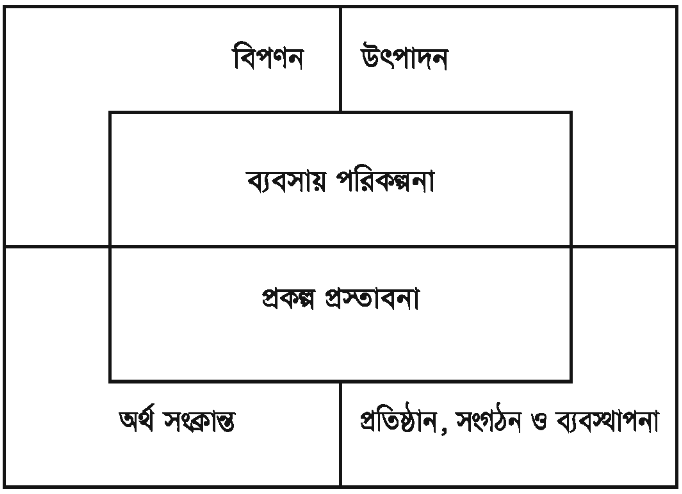

১. উৎপাদন পরিকল্পনা : প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। এ উপযোগ প্রধানত তিন ভাগে সৃষ্টি করা হয়। যথা-১. সময়গত ২. স্থানগত এবং ৩. রূপগত উপযোগ।

ব্যবসায় পরিকল্পনার একটি শাখা হিসেবে উৎপাদন পরিকল্পনার স্থান সর্বপ্রথম। উৎপাদন পরিকল্পনার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচ্য।

-কীভাবে উৎপাদন হবে
-কতটুকু উৎপাদন হবে

–কী দিয়ে উৎপাদন হবে

–কোথায় উৎপাদন হবে

–কাকে দিয়ে উৎপাদন হবে

২. সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা : উৎপাদনের উপকরণসমূহকে বিভিন্ন উৎস থেকে একত্রিত করাকে সংগঠন বলে। অন্যদিকে অধস্তনদের দ্বারা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করিয়ে নেয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে। সংগঠন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হস্তস্বরূপ এবং ব্যবস্থাপনা চক্ষুস্বরূপ। ব্যবসায়ের আবশ্যকীয় উপাদান সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সার্থকভাবে প্রণয়ন করতে হলে নিম্নের প্রশ্নগুলোর সমাধান হওয়া আবশ্যক।

–কীভাবে সংগঠিত করা হবে

–কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে

–কে ব্যবস্থাপনা করবে

–কীভাবে সমন্বয় করা হবে

–কীভাবে সম্প্রসারণ করা যাবে

৩. অর্থায়ন পরিকল্পনা : ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার প্রাক্কালে অর্থের উৎস অনুসন্ধান এবং তা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে অর্থায়ন বলে। অর্থ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের রক্ত সঞ্চালনের সাথে তুলনীয়। অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ব্যবসায়ীকে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হয়।

–কীসে অর্থায়ন করা হবে

–কীভাবে অর্থায়ন করা হবে

–কে অর্থায়ন করবে

–কীভাবে খরচ নির্ধারণ করা হবে

–কীভাবে মুনাফা হবে

৪. বিপণন পরিকল্পনা : উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের স্থান হতে ক্রেতার কাছে প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে বিপণন বলে। বিপণন পরিকল্পনার মধ্যে ক্রয়, বিক্রয়, অর্থায়ন, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া আবশ্যক।

–কী বিক্রয় করা হবে

–কার কাছে বিক্রয় করা হবে

–কতটুকু বিক্রয় করা হবে

–কত দামে বিক্রয় করা হবে

–কীভাবে বিক্রয় করা হবে

ব্যবসায় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়

একটি তথ্য নির্ভর ও বাস্তবসম্মত ব্যবসায় পরিকল্পনায় সাধারণত নিম্নোক্ত চারটি পর্যায়/ধাপ থাকে :

১। চিহ্নিতকরণ পর্যায় : এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত ব্যবসায় প্রকল্পের ধারণা চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ফলাফল অনুকূলে হলে পরবর্তী পর্যায় শুরু হয়, অন্যথায় ধারণাটি বাতিল করা হয়।

২। প্রাক–নির্বাচনী পর্যায় : এ পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত প্রকল্প ধারণার প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামর্থ্য, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফলাফল অনুকূল হলে পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হয়।

৩। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায় : এ পর্যায়ে বাজার সমীক্ষা, কারিগরি দিক বিশ্লেষণ ও সংগঠনের ধরন বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।

৪. মূল্যায়ন পর্যায় : সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ফলাফল অনুকূলে হলে আর্থিক দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগের ফলাফল/লাভ–ক্ষতি মূল্যায়ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফলাফল অনুকূল না হলে প্রকল্প পরিকল্পনা বাতিল করা হয় এবং ফলাফল অনুকূল হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত অনুশীলন

উদ্দেশ্য	:	অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থীরা প্রকল্প প্রণয়ন করা সম্পর্কে ধারণা পাবে। প্রকল্প থেকে আয়–ব্যয়ের হিসাব করতে পারবে।
সময়	:	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট – ২ ঘণ্টা
উপকরণ	:	বোর্ড, চক/ বোর্ড মার্কার ইত্যাদি।
ধাপসমূহ	:	
ধাপ–১	:	শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ হবে।
ধাপ–২	:	প্রত্যেক দল উল্লিখিত ৪টা প্রশ্নের উত্তর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বের করবে।
ক)		প্রকল্পের জন্য কত টাকা লাগবে?
খ)		প্রকল্পের জন্য কী কী উপকরণ লাগবে?
গ)		কী কী কিনতে হবে?
ঘ)		কত টাকা লাভ হবে?

শিক্ষকের করণীয়

–অনুশীলন শেষে প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট একটি প্রকল্প নিয়ে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করবেন।
–প্রকল্পের নাম :
–প্রকল্পের জন্য টাকার পরিমাণ .... টাকা
স্থায়ী খরচ : .... টাকা
(যে খরচ ১ বছরের বেশি সময়ের জন্য হবে; যেমন, রিক্সা প্রকল্পের জন্য রিক্সার পুরোটার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ)

খরচের বিবরণ/খাত

–	:	.... টাকা
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "
–	:	.... "

চলতি খরচ .... টাকা

(যে খরচ এক বছরের কম সময়ের জন্য হবে; যেমন, রিক্সা প্রকল্পের জন্য হারিকেনের তেল, ফিতা, মেরামত খরচ, নিজের মজুরি ইত্যাদি)

খরচের বিবরণ/খাত

–	:	.... টাকা
–	:	.... "
–	:	.... "

এক মাসে কত খরচ হবে তা বের করার জন্য স্থায়ী খরচের অবচয় বের করতে হবে। অবচয় খরচ বের করার নিয়ম হল নির্দিষ্ট যন্ত্রটি কত বছর কাজের উপযোগী থাকবে সে বছরের সংখ্যা দিয়ে যন্ত্রটির ক্রয়মূল্যকে ভাগ করলে এক বছরের খরচ বের হবে। এ পরিমাণকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে এক মাসের অবচয় খরচ বের হবে। এ খরচের সাথে ১

মাসের গড় খরচ যোগ করলে ১ মাসের মোট খরচ বের হবে। এক মাসের সর্বমোট আয় থেকে এক মাসের মোট খরচ বাদ দিলে আসল লাভ বের হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়

–প্রকল্প পরিকল্পনা করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ।

–প্রকল্প থেকে আয়–ব্যয়ের হিসাব বের করার পদ্ধতি জানা।

প্রকল্প সম্প্রসারণ (কেইস/ ইতিবৃত্ত) দুলাল বেকারি

আমজাদ হোসেনের বয়স যখন ১৪–১৫ তখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে বরিশালে একটি রুটির কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। কারখানার মালিক তাকে তিনবেলা খাবার দিতেন। পারিশ্রমিক বলতে সে কিছুই পেত না। তবে, মালিক মাঝে মাঝে দু এক টাকা হাত খরচের জন্য দিতেন। আমজাদ এতেই বেশ খুশি। কেননা, বাড়িতে সে কোনোদিন দু বেলা পেট ভরে খেতে পেত না।

বেকারিতে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা আমজাদকে খুব স্নেহ করত। আমজাদ বেকারিতে কাজে ফাঁকি দিত না। মালিক তাকে খুব পছন্দ করতেন। এক বছর পরই আমজাদের বেতন নির্দিষ্ট হয় মাসে ১০০ টাকা। এটা ১৯৬৭–৬৮ সালের ঘটনা। আমজাদ ধীরে ধীরে কারখানার সমস্ত কাজ শিখে ফেলে এবং মালিকের আস্থা অর্জন করে। ১৯৭০ সালে কারখানার একজন দক্ষ শ্রমিক কারখানা ছেড়ে চলে যায়। মালিক আমজাদকে তার জায়গায় নিযুক্ত করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দু জন শ্রমিক কারখানা ছেড়ে দেয়। মালিকও কারখানার দিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে পারেন না। আমজাদকে কারখানার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার দায়িত্বও আমজাদকে নিতে হয়। মালিক পুঁজি খাটাতে চান না। কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। তখন থেকেই আমজাদের স্বপ্ন সে নিজেই একটি রুটির কারখানা দিবে। এ উদ্দেশ্যেই ১৯৭৪ সালে গৌরনদী উপজেলার টোরকি বন্দরে ৬ শতাংশ জমি মাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে রাখে।

টোরকি বন্দর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে নৌকা, লঞ্চ, বাস ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন ১০/১৫ হাজার লোক এ বন্দরে ব্যবসায়ের জন্য জমা হয়। শুক্র ও মঙ্গলবার সাপ্তাহিক হাটের দিন। এ দু দিন ৩০ থেকে ৪০ হাজার লোকের আনাগোনা হয় এ বন্দরে। বৃহস্পতিবার দিন গরুর হাট বসে। এ হাটটি দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গরুর হাট বলে বিবেচিত।

আমজাদ ১৯৭৮ সালে টোরকি বন্দরের পূর্বে ক্রয়কৃত জমিতে 'দুলাল বেকারি' নামে একটি বেকারি স্থাপন করে। 'দুলাল বেকারি'র জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন ছিল, তা আমজাদের ছিল না। তাই তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ৩ জন কর্মচারি রেখে দুলাল বেকারির কাজ শুরু করে।

প্রথমে আমজাদ পাউরুটি, বনরুটি ও টোস্ট বিস্কুট তৈরি করে। প্রথম দিকে দৈনিক ৩০০ কেজি ময়দার বিভিন্ন পণ্য তৈরি করতো। রুটি ও বনরুটি বাসি হলে তা খাবারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং তা বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তাই, আমজাদ অল্প পরিমাণ পণ্য তৈরি করে এবং উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

টোরকি বন্দরে বরিশাল শহর থেকে রুটি, কেক, নানা ধরনের বিস্কুট ইত্যাদি প্রতিদিন আসতো। ইতোপূর্বে টোরকি বন্দরে কোন বেকারি ছিল না। লোকেরা আটার রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল। বন্দরে ১০/১২টি হোটেল আছে। এসব হোটেলে পরাটা ও চাপাতি বিক্রি হয়। আমজাদ মোরব্বা ও কিশমিশ যুক্ত বনরুটি বানায় এবং তার পাউরুটি ও বনরুটির উপরে একটি সুন্দর প্রলেপ দেয়। মিষ্টি বেশি থাকাতে তার রুটির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ রুটি খাবার জন্য অন্য কোন জিনিসের অর্থাৎ ডাল, শাকসবজির প্রয়োজন হয় না। শুধু খেতেই মজা। তাই লোকজন এটা পছন্দ করে। আমজাদ আস্তে আস্তে বাজারের অন্যান্য মনিহারি দোকান ও হোটেলে তার বেকারির পণ্যসমূহ বিক্রি করতে থাকে। তবে, দোকানদার ও হোটেলের মালিকরা তার মালের জন্য নগদ টাকা দেয় না। বাকি টাকা তুলতে আমজাদকে মাঝে মাঝে ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। ইতোমধ্যে আমজাদের প্রায় পনের হাজার টাকা বাজারে বাকি পড়ে যায়।

'দুলাল বেকারি'তে একটি স্থায়ী চুলা তৈরি করার জন্য আমজাদ স্থানীয় এন.জি.ও 'সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন' (আই.এস.ডি)–এর কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নেয়, যা আমজাদ সময়মতো সুদসহ পরিশোধ করে দেয়। আই.এস.ডি ১৯৮০ সাল থেকে বরিশাল জেলায় প্রান্তিক কৃষকদের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আই.এস.ডি'র কিছু আয়মূলক প্রকল্প রয়েছে। আমজাদ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে আই.এস.ডি–তে ১৯৮৩ সালে যোগদান করে।

আমজাদ তার পণ্য বিক্রি করার জন্য বেকারি সংলগ্ন একটি শো–রুম তৈরি করে। এতে তার খরচ হয় প্রায় ৮,০০০ টাকার মতো। শো–রুম করার ফলে আমজাদের পণ্য বিক্রির মাত্রা বেড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন 'দুলাল বেকারি'র পণ্যের গুণগত মান সম্বন্ধে নিশ্চিত। আমজাদ তার পণ্যের গুণগত মান রক্ষা করার ব্যাপারে কোন সময় আপোষ করেনি। সে ভেজাল উপাদান দিয়ে মাল তৈরি করে না। আমজাদকে সবাই সৎ ব্যবসায়ী বলে জানে। আস্তে আস্তে তার বেকারি প্রসার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে দুলাল বেকারিতে ১০ জন কর্মচারি কাজ করছে। আমজাদের মতে পাউরুটিতে লাভ তেমন হয় না, যদিও উৎপাদিত দ্রব্যের শতকরা ৫০ ভাগই হল পাউরুটি। বর্তমানে প্রতি ৪০ কেজি ময়দায় সঠিকভাবে পাউরুটি বানাতে খরচ হয় ৬২৫ টাকার মতো। অধিক খরচ হওয়ার প্রধান কারণ হল চিনি, তেল ও ডালডার দাম বৃদ্ধি। সমস্ত খরচপত্র বাদ দিয়ে ৪০ কেজি ময়দার পাউরুটিতে ১২৫ টাকা থেকে ১৩৫ টাকা লাভ থাকে। তবে বাকিতে মাল বিক্রি করতে হয় বলে লাভ তেমন থাকে না।

আমজাদ টোস্ট বিস্কুট বানায়। টোস্ট বিস্কুট বানাতে এক মণ পরিমাণ ময়দার জন্য চিনি ও ডালডা বেশি দিতে হয়। টোস্ট বিস্কুট বেশি দিন রাখা যায়। সহজে নষ্ট হয় না। এক মণ ময়দার টোস্ট বিস্কুটে ৫২ কেজি বিস্কুট হয়। মোট খরচ পড়ে ১১,১০০ টাকা। প্রতি পাউন্ড পাইকারি বিক্রি করে ২৭ টাকা দরে এবং খুচরা ৩০ টাকা দরে।

টোস্ট বিস্কুটে পাউরুটির চেয়ে মুনাফা ভালো, তবে দৈনিক এক মণের বেশি বিক্রি করা যায় না। আমজাদ কেকও বানায়। কেক বানাতে খরচ বেশি। ৪০ কেজি ময়দার মোরব্বা–কেক বানাতে খরচ হয় ৪,৮০০ টাকার মতো। ৪০ কেজি ময়দার মোরব্বা কেক বানালে ৩০০ পাউন্ডের কেক হয়। কেকের পাউন্ড পাইকারি বিক্রি হয় কুড়ি টাকা দরে এবং খুচরা চব্বিশ টাকা দরে। কেকের চাহিদা আছে বাজারে।

এ ছাড়াও আমজাদ মিষ্টি বিস্কুট তৈরি করে। একমণ ময়দায় ৯০ কেজি মিষ্টি বিস্কুট তৈরী হয়। এ বিস্কুট পাউন্ড প্রতি পাইকারি বিক্রি হয় বত্রিশ টাকায় এবং খুচরা সাঁইত্রিশ টাকায়। আমজাদের মতে তার বেকারি ব্যবসায় সফলতার বড় কারণ হচ্ছে, পণ্যের মান ঠিক রাখা। পণ্যের মান ঠিক রাখতে হলে খাঁটি জিনিসের ব্যবহার, চুলার সঠিক তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কারিগরের দক্ষতা অত্যাবশ্যক। আমজাদ নিজ হাতে কাজ করে। আমজাদ বেশ কিছু দিন ধরে চিন্তা করছে নতুন একটি চুলা তৈরি করার জন্য। বৈদ্যুতিক চুলা করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাছাড়া বৈদ্যুতিক চুলার সমস্যা হল বিদ্যুৎ সবসময় থাকে না। চুলার ভিতর যদি পণ্য সামগ্রী থাকে এবং বিদ্যুৎ চলে যায়, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। আর সে জন্যই আমজাদ একটি নিজস্ব জেনারেটর রাখতে চায়।

১৯৯৮ সালের বন্যায় আমজাদের বেকারি প্রায় তিন মাস বন্ধ ছিল। তখন চুলার ভীষণ ক্ষতি হয়। ভালো চুলা না হলে পণ্য সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি টোরকি বাজারে নতুন আরেকটি বেকারি স্থাপিত হয়েছে। যদিও নতুন বেকারির পণ্য দুলাল বেকারির মতো নয় তথাপি বাজার সম্প্রসারণে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমজাদকে।

আমজাদ মনে করে বেকারি সম্প্রসারণের জন্য একটি ভালো চুলার প্রয়োজন। এখন কোন ধরনের চুলা তৈরি করবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব। পণ্য ভালো করতে হলে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এর জন্য চাই সঠিক চুলা।

আমজাদ আই.এস.ডি এর কাছে ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ পাবার জন্য আবেদন করেছে। আই.এস.ডি–র কর্মকর্তারা আমজাদের এই ঋণ আবেদনকে 'প্রকল্প সম্প্রসারণের' অধীনে মূল্যায়নের পর আমজাদের কাছে বেকারি পণ্যের মোট উৎপাদন, মোট আয়, এলাকার মোট চাহিদা ইত্যাদি জানতে চেয়ে চিঠি দেয়। আমজাদ এ চিঠি পেয়ে ঋণ পাবার আশায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তথ্যগুলো সরবরাহ করে। আই.এস.ডি কর্মকর্তারা

আমজাদের সরবরাহ করা তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় যে ইলেকট্রিক চুলার জন্য যা ব্যয় হবে তা থেকে মুনাফা পেতে হলে আমজাদের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, যা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে না। আমজাদ তাই স্থির করেছে আরও একটি স্থানীয়ভাবে তৈরি চুলা বসাবে এবং দুই চুলার একটি মুখ রাখবে, তাতে লাকড়ি কম খরচ হবে এবং উৎপাদন মাত্রা ৫০% বাড়বে। (অধ্যায়ের খরচের বিবরণ উল্লিখিত সময়ের বাজার দর অনুসারে)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণত ব্যবসায় পরিকল্পনার কোন পর্যায়ে প্রকল্পের দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিসমূহ বিশ্লেষণ করা যায় ?

ক. মূল্যায়ন খ. চিহ্নিতকরণ
গ. প্রাক-নির্বাচনী ঘ. প্রকল্প প্রণয়ন

২. বিপণন পরিকল্পনা করার সময় চিন্তা করতে হবে-

i. কী বিক্রয় করা হবে
ii. কতটুকু পণ্য উৎপাদন করতে হবে
iii. কীভাবে অর্থায়ন করা হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রধান দিকগুলো হচ্ছে ?

i. উৎপাদন
ii. মূল্যায়ন
iii. বিপণন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪-৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

মি. লোকমান চৌধুরির ঢাকার আমারবাগ এলাকায় একটি মুদ্রণ কারখানা রয়েছে। এই ব্যবসায়ে তিনি সফলতা পেয়েছেন, তার সঠিক ব্যবসায় পরিকল্পনার জন্য। তবে কাগজ সরবরাহের বিলম্বের কারণে মাঝে মধ্যে তার ব্যবসায় বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. ব্যবসায় পরিকল্পনার শাখা হিসাবে মি. চৌধুরি সর্বপ্রথম কোনটি বিবেচনা করেছেন ?

ক. উৎপাদন খ. বিপণন
গ. সংগঠন ঘ. ব্যবস্থাপনা

৫. কাগজ সরবরাহ বিলম্বের কারণে মি. চৌধুরির ব্যবসায় পরিকল্পনার কোন অংশ প্রভাবিত হয় ?

ক. উৎপাদন — খ. আর্থিক

গ. বাজারজাতকরণ — ঘ. ব্যবস্থাপনা

৬. আর্থিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মি. চৌধুরি বিবেচনা করেছেন–

ক. ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি

খ. বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন

গ. সুলভ মূল্যে কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণ

ঘ. মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাকিয়া আক্তার একজন গৃহিণী। তিনি তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চান। এজন্য ঢাকার মিরপুরে তার নিজের বাড়িতেই নকশিকাঁথা তৈরির একটি শিল্প স্থাপনের জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ের সাফল্যের বিষয়ে তিনি বেশ শঙ্কিত। তাই তিনি তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য ব্যবসায় শুরুর পূর্বেই সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন।

ক. ব্যবসায় পরিকল্পনা বলতে কী বুঝ?

খ. জাকিয়া আক্তারের পরিকল্পিত শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. জাকিয়া আক্তারের নকশিকাঁথা তৈরির ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কী কী করণীয় হতে পারে?

ঘ. জাকিয়া আক্তারের পরিকল্পিত ব্যবসায়টির সফলতার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি কর।

অধ্যায় ৮

হিসাব রক্ষণ ও মুনাফা পরিকল্পনা

অধ্যায় সূচি

১. ভূমিকা
২. হিসাব রক্ষণের সংজ্ঞা
৩. হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য
৪. হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব
৫. হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি
৬. হিসাব চক্র
৭. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় হিসাব ও বিবরণী
৮. ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বর্তপত্র
৯. মুনাফা পরিকল্পনা

ভূমিকা

হিসাব ব্যবসায়ের জীবন। নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে হিসাব না রাখলে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখা কঠিন। যেসব ব্যবসায় শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যে অকৃতকার্য হতে দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ ব্যবসায় লেনদেনের সঠিক হিসাব না রাখা। একটি ব্যবসায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেন-দেন সংগঠিত হতে থাকে যা যথাসময়ে হিসাব বইয়ে বা খাতায় লিপিবদ্ধ না করলে মনে রাখা অসম্ভব এবং এ কারণে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান, দেনা-পাওনা এবং আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এজন্য ব্যবসায়ীদের বেলায় হিসাব রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা হিসাব রক্ষণের অর্থ ও গুরুত্ব, হিসাব রক্ষণের পদ্ধতি, নগদান বই, আয়-ব্যয় হিসাব, চূড়ান্ত হিসাব এবং মুনাফা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

হিসাব রক্ষণের সংজ্ঞা : হিসাব রক্ষণ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের আর্থিক লেন-দেন হিসাবের খাতায় বা বইয়ে লিপিবদ্ধ করা। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রাখাকেই হিসাব রক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে কলাকৌশল ও নিয়মনীতির সাহায্যে ব্যবসায়িক লেন-দেনসমূহ হিসাবের খাতায় বা বহিতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর লেন-দেনের প্রকৃতি ও ফলাফল এবং সঠিক অবস্থা নিরূপণ করা যায় তাকে হিসাব রক্ষণ বলে।

হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য : ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সব আর্থিক লেন-দেন সংগঠিত হয়ে থাকে সেগুলোর ফলাফল জানা প্রয়োজন। সংগঠিত লেনদেনগুলো যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং তা থেকে ফলাফল নির্ণয় হিসাব রক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। নিচে হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হল।

(ক) আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা : হিসাবের খাতায় বা বইতে আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) আর্থিক লেন-দেনের ফলাফল নির্ণয় : একটি নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক লেন-দেনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের ফলাফল বা লাভ-লোকসান নির্ণয় হিসাব রক্ষণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

(গ) আর্থিক অবস্থা নিরূপণ : ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা, সম্পত্তি, মূলধন ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হিসাব রক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(ঘ) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ : ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব; যেমন- বেতন, মজুরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ দৃষ্টিতে রেখে আয় বুঝে ব্যয় করা হিসাব রক্ষণের আর একটি লক্ষ্য।

(ঙ) লেন-দেনের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই : লেন-দেন যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা তার গাণিতিক শুদ্ধতা রেওয়ামিল তৈরির মাধ্যমে যাচাই হিসাব রক্ষণের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব

হিসাব রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কত যে বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে–জঙ্গলে বাস করত এবং ফলমূল আহার এবং পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তখন মাটিতে দাগ দিয়ে, বাকলে আঁচড় কেটে, দেয়ালে দাগ কেটে এবং আরও কিছু উপায়ে হিসাব রাখত। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব রক্ষণের প্রকৃতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে হিসাব রক্ষণের ভিত্তি হল দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি, যা ব্যবসায়ের জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হিসাব রক্ষণের আবশ্যকতা নিচে বর্ণনা করা হল।

(ক) স্থায়ীভাবে হিসাব রক্ষণ : মানুষের স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু স্মরণ রাখা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের বহু আর্থিক লেন–দেন সংগঠিত হয়ে থাকে। মালিক বা কর্মচারিদের পক্ষে এগুলো স্মরণ রেখে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এটি তখনই সম্ভব যদি লেন–দেনগুলো হিসাবের খাতায় তারিখ ও পরিমাণ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়। ফলে স্থায়ী ও নির্ভুল হিসাব রাখার স্বার্থে হিসাব রক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

(খ) আর্থিক ফলাফল নিরূপণ : সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে হিসাব রক্ষণের ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান ও ফলাফল নিরূপণ করা যায়।

(গ) ভুল বুঝাবুঝির অবসান : লেন–দেন লিপিবদ্ধ থাকলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে না। কোনো কারণে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলে সংরক্ষিত সঠিক হিসাব প্রদর্শন করে তা নিরসন করা যায়।

(ঘ) ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় সাহায্য : হিসাব রক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মালিক ও ব্যবস্থাপনাকে ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। যেমন– পূর্বের হিসাবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বাজেট, যথা–আর্থিক ও মুনাফা বাজেট প্রণয়ন করা যায়।

(ঙ) বিভিন্ন উৎস থেকে সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ : ব্যবসায় সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য–সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। যেমন, পুঁজির স্বল্পতা মিটানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ, কাঁচামাল সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বাকিতে ক্রয়, আমদানি–রপ্তানি লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য ব্যবসায়ের লিপিবদ্ধ হিসাব একান্তভাবে প্রয়োজন।

হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

হিসাব রক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কেউ নোট বইয়ে হিসাব লিখে, কেউ খাতায় লিখে, আবার কেউ সনাতন পদ্ধতির লাল মলাটের খাতায় লিখে। আধুনিক হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বলতে দু তরফা হিসাব পদ্ধতিকে বুঝায়।

দু তরফা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি

হিসাব রক্ষণের যে পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেকটি লেন–দেনের দ্বৈত সত্তা এবং যুগপৎ দুটি পক্ষের সমপরিমাণ টাকায় একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাব রাখা হয় তাকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়। লেন–দেনের দ্বৈত সত্তা বলতে হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট দিককে বুঝায়। আর্থিক লেন–দেনের দুটি পক্ষ থাকে—এক পক্ষ প্রাপক বা গ্রহীতা এবং অন্য পক্ষ দাতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জনাব করিমকে ২০০ টাকা দেয়া হল। এখানে করিম গ্রহীতা পক্ষ এবং ব্যবসায়ের নগদান হিসাব দাতাপক্ষ। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের জাবেদা বহিতে এভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে :

	ডেবিট টাঃ	ক্রেডিট টাঃ
করিম হিসাব ডেটর	২০০/–	–
টু নগদ হিসাব–	–	২০০/–

প্রকৃত পক্ষে যে হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থায় প্রতিটি লেন–দেনের একই সাথে দুটি হিসাব খাতকে ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ের সঠিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায় তাকে দু তরফা হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি বলে।

হিসাব চক্র

দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এর ধারা অনুযায়ী হিসাব প্রক্রিয়া চক্রাকারে অবিরাম চলতে থাকে। এ পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণের কাজ শুরু হয় লেন-দেন জাবেদাকরণের মাধ্যমে এবং পুনরায় জাবেদাতে এসে কাজটি শেষ হয়। এভাবে চক্রাকারে ধারাবাহিকভাবে হিসাবের কাজ চলতে থাকে বলে একে হিসাব চক্র বলা হয়। হিসাব চক্রকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা:

১। জাবেদাকরণ (লিপিবদ্ধকরণ)
২। খতিয়ান ভুক্তি (শ্রেণীবদ্ধকরণ)
৩। রেওয়ামিল তৈরি (সংক্ষিপ্তকরণ)
৪। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত (চূড়ান্তকরণ)
৫। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (অনুপাত বিশ্লেষণ)

১। জাবেদাকরণ (Journal)

ব্যবসায় সংগঠিত লেনদেনগুলো বহিতে লিপিবন্ধ করার কাজকে জাবেদাকরণ বলে। এটি হিসাব চক্রের প্রথম স্তর। জাবেদা বইগুলোর মধ্যে ক্রয় বই, বিক্রয় বই, ক্যাশ বই, বিল প্রাপ্তি বই, বিল প্রদেয় বই অন্যতম।

২। খতিয়ানভুক্তি (Ledger)

জাবেদায় রেকর্ডভুক্ত লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করে খতিয়ানে স্থানান্তর করে জের বের করাই খতিয়ানভুক্তি। এটি হিসাব চক্রের দ্বিতীয় স্তর। লেজারে বিভিন্ন ধরনের হিসাব যেমন মূলধন হিসাব, ব্যাংক হিসাব, বেতন হিসাব, ক্রয় হিসাব, বিক্রয় হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব, কমিশন হিসাব ইত্যাদি রাখা হয়।

হিসাব চক্র

৩। রেওয়ামিল (Trial Balance)

হিসাব চক্রের তৃতীয় স্তরে প্রতিটি হিসাবের জের নিয়ে রেওয়ামিল তৈরি করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল হিসাবের গাণিতিক বিশুদ্ধতা যাচাই করা। ভুল না থাকলে রেওয়ামিলের দু দিক সমান হয়ে থাকে।

৪। আর্থিক বিবরণী তৈরি (Financial Statement)

ব্যবসায় আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য রেওয়ামিল ও সমন্বয়ে উল্লিখিত তথ্য থেকে এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র তৈরি করা হয়।

৫। আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Analysis of Financial Statement)

হিসাব চক্রের এ পর্যায়ে ব্যবসায়ে অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। বিশ্লেষণের তথ্য থেকে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ ব্যবসায় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। এ পর্যায়ে আর্থিক বিবরণীর অনুপাত বিশ্লেষণ ও সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় হিসাব ও বিবরণী

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণ ব্যয়সাধ্য ও কঠিন। তবে সুষ্ঠ হিসাব রক্ষণের স্বার্থে এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখা ভালো। নিচে আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে প্রয়োজনীয় হিসাব রক্ষণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ক্যাশ বই : যে বইয়ে ব্যবসায় নগদ লেন-দেন সুশৃঙ্খলভাবে রেকর্ড করা হয় তাকে ক্যাশ বই বলে। ছোট ব্যবসায়ের জন্য ক্যাশ প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব যথাযথভাবে রক্ষণের গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি ব্যবসায় বছরের শেষে লোকসান করলেও চলতে পারে কিন্তু নগদ প্রবাহের আকাঙ্ক্ষিত ধারা বিঘ্নিত হলে এর অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে।

নগদ প্রাপ্তি ও নগদে প্রদান নগদান বইয়ে রেকর্ড করা হয়। অতীতের বাকি ক্রয়ের দেনা নগদে পরিশোধ এবং বাকি বিক্রয়ের পাওনা নগদে পাওয়া গেলে ক্যাশ বইয়ে লিখতে হয়। দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে গ্রাহকের কাছ থেকে চেকের

মাধ্যমে পেমেন্ট পাওয়া গেলে ক্যাশ বইয়ে লেখা হয়। চেকের টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে এবং নগদ টাকা ব্যাংকে জমা দিলে এগুলো ক্যাশ বইতে লিখতে হয়। প্রকৃতপক্ষে নগদ প্রাপ্তি ক্যাশ বইয়ের বাম পাশের পৃষ্ঠায় জমার পাতায় এবং নগদ প্রদান ডান পাশের পৃষ্ঠায় খরচের পাতায় লিখতে হয়। ক্যাশ বইয়ের উপরে যে বছরের হিসাব তা লিখে রাখতে হয়। যে মাসের জন্য ক্যাশ বই তৈরি করা হয় সে মাসের নামও লিখতে হয়। ক্যাশ বই দু ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশে তারিখ, বিবরণ, ভাউচার নং, লেজার নং এবং টাকার পরিমাণ লেখার কলাম থাকবে। তারিখের কলামে লেন-দেনের তারিখ, বিবরণ কলামে কোন খাতে জমা ও খরচ তা লিখতে হয়।

ভাউচার (Voucher)

লেন-দেনের প্রমাণ পত্র হল ভাউচার এবং আইনানুগ গ্রহণযোগ্য দলিল। কোনো দোকান থেকে কিছু কিনলে যে ক্যাশমেমো দেয়া হয় তাই ভাউচার। ভাউচারে ১ থেকে ক্রমিক নম্বর দিতে হয় এবং তা সংরক্ষণ করতে হয়। ভাউচার নম্বর ক্যাশ বইয়ের ভাউচার কলামে লিখতে হয়। বেতনের জন্য ভিন্ন ভাউচারের প্রয়োজন হয় না। হাজিরা খাতায় প্রাপকের স্বাক্ষরসহ লিখে রাখলেই চলে। ব্যাংকে জমার রসিদ আর চেকের উপর আলাদা নম্বর দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এগুলো আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

খতিয়ান (Ledger)

লেজার বা খতিয়ান হল বিভিন্ন নামের হিসাব রক্ষণের পাকা বই। ক্যাশ বইয়ের লেজার নম্বর হল লেজারের যে পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট হিসাব লেখা হয় সে পৃষ্ঠা নম্বর। লেন-দেন সংগঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ বইয়ে লিখতে হয়। একই এন্ট্রি আবার লেজার বইয়ে লিখতে হয়। এতে সুবিধা এই যে ক্যাশ বই দেখে জানা যায় লেজারের কত পৃষ্ঠায় এ হিসাবটি লেখা আছে। আর নম্বর দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় এন্ট্রিটি লেজারে লেখা হয়েছে কিনা।

পরবর্তীতে টাকার ঘরে প্রয়োজনীয় অংকটা লিখতে হয়। নির্দিষ্ট সময় বা মাসের শেষে দু পাশের অংশ যোগ করে নগদান বইয়ের জের বের করতে হয়। লক্ষ রাখতে হবে যে একঘরা নগদান বইয়ের বেলায় খরচের মোট অংশ কখনই জমার মোট অংকের চেয়ে যেন বেশি হতে না পারে। যদি মাসান্তে জমার পরিমাণ খরচের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তা নগদান বইয়ের ডেবিট পাশে উদ্বৃত্ত তহবিল। পরের মাসের নগদান বইয়ে তা প্রারম্ভিক নগদান হিসাবে দেখানো হয়। নগদান বই একদিকে জাবেদা বই আবার অন্যদিকে খতিয়ানভুক্ত হিসাব। প্রারম্ভিক তহবিল খতিয়ানভুক্ত হিসাবে ডেবিট দিকে লিখতে হবে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া গেল :

জনাব জামালের নিম্নলিখিত লেন-দেনগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।
১৯৯৯ সাল

এপ্রিল	১	হাতে নগদ	–	–	–	–	২০০০.০০	টাকা
”	১	রহিমের কাছ থেকে পাওয়া গেল	–	–	–	–	১৫০০.০০	”
”	২	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	৩	নগদে মাল ক্রয়	–	–	–	–	২২০০.০০	”
”	৩	বেতন প্রদান	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	৪	ঘর ভাড়া পরিশোধ	–	–	–	–	১০০০.০০	”
”	৬	করিমের কাছে নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	৪০০০.০০	”
”	৮	শামীমের কাছ থেকে নগদে ক্রয়	–	–	–	–	৫০০০.০০	”
”	১০	ব্যাংক থেকে উত্তোলন	–	–	–	–	৩০০০.০০	”
”	১২	যাতায়াত বাবদ খরচ	–	–	–	–	৫০০.০০	”
”	১৫	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”
”	১৬	কাশেমকে প্রদান	–	–	–	–	৫০০.০০	”
”	২০	রহিমের কাছ থেকে প্রাপ্তি	–	–	–	–	২৮০০.০০	”
”	২০	নগদে ক্রয়	–	–	–	–	১৫০০.০০	”
”	২২	নগদে ক্রয়	–	–	–	–	১২০০.০০	”
”	২৫	বেতন প্রদান	–	–	–	–	৬০০০.০০	”
”	৩০	নগদে বিক্রয়	–	–	–	–	২৫০০.০০	”

নগদান বইয়ের ছক

জামালের নগদান বই; এপ্রিল, ১৯৯৯

ডেবিট **ক্রেডিট**

তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	লেজার	টাকা	তারিখ	বিবরণ	ভাউচার নং	লেজার	টাকা
১	টু প্রারম্ভিক তহবিল	–	–	২০০০.০০	৩	বই ক্রয় হিঃ	–	–	২২০০.০০
”	” রহিম হিসাব	–	–	১৫০০.০০	৩	বেতন হিসাব	–	–	২৫০০.০০
২	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	৪	ঘর ভাড়া হিঃ	–	–	১০০০.০০
৬	” বিক্রয় হিসাব	–	–	৪০০০.০০	৮	ক্রয় হিসাব	–	–	৫০০০.০০
১০	” ব্যাংক হিসাব	–	–	৩০০০.০০	১২	যাতায়াত হিসাব	–	–	৫০০.০০
১৫	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	১৬	কাশেম হিসাব	–	–	৫০০.০০
২০	” রহিম হিসাব	–	–	২৮০০.০০	২০	ক্রয় হিসাব	–	–	১৫০০.০০
৩০	” বিক্রয় হিসাব	–	–	২৫০০.০০	২২	ক্রয় হিসাব	–	–	১২০০.০০
					২৫	বেতন হিসাব	–	–	৬০০০.০০
						” ব্যালেন্স সি/ডি	–	–	৪০০.০০
				২০,৮০০.০০					২০,৮০০.০০
১ মে ১৯৯৯	টু–ব্যালেন্স বি/ডি			৪০০.০০					

১লা মে টু ব্যালেন্স সি/ডি ৪০০.০০

ক্রয়–বিক্রয় হিসাব,

লাভ–লোকসান হিসাব ও উদ্বর্তপত্র

সারা বছরব্যাপী ক্রয়–বিক্রয়ের ফলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর কত লাভ বা লোকসান হল এবং সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ কত তা জানতে চান। এজন্য তাকে বছরের জন্য ক্রয়–বিক্রয় হিসাব লাভ–লোকসান হিসাব এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করতে হবে। যদি নগদান বই ও লেজার নিয়মিত যথাযথভাবে লেখা হয়ে থাকে তবে ক্রয়–বিক্রয় ও লাভ–লোকসান হিসাব এবং ব্যালেন্সশিট তৈরি করা কঠিন নয়। আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হিসাবের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করেন। রেওয়ামিলে প্রদত্ত তথ্য থেকে ব্যবসায়ের ক্রয়–বিক্রয় হিসাব, লাভ–লোকসান হিসাব এবং উদ্বর্তপত্র তৈরি করা যায়। কীভাবে এসব বিবরণী প্রস্তুত করা যায় তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা যায়।

উদাহরণ

জনাব হাসিবুল কাইয়ুমের নিম্নলিখিত রেওয়ামিল থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত এবং উক্ত তারিখে ব্যবসার একটি উদ্বর্তপত্র তৈরি কর।

জনাব কাইয়ুম
রেওয়ামিল
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
	টাকা	টাকা
মূলধন	–	৫০,০০০.০০
উত্তোলন	১৩,০০০.০০০	–
মজুদ (১–১–৯৯)	১০,০০০.০০০	–
ক্রয়	২৩,০০০.০০	–
ক্রয় ফেরত	–	৩,০০০.০০
বিক্রয়	–	৩০,০০০.০০
বিক্রয় ফেরত	৩,০০০.০০	–
মজুরি	১,৫০০.০০	–
দেনাদার	৫,০০০.০০	–
পাওনাদার	–	২,০০০.০০
পরিবহন	৫,০০০.০০	–
বেতন	২,৫০০.০০	–
বাড়িভাড়া	২,৩০০.০০	–
বীমা সেলামি	১,৪০০.০০	–
বিজ্ঞাপন খরচ	১,৩০০.০০	–
আসবাবপত্র	৫,০০০.০০	–
সাজসরঞ্জাম	৪,০০০.০০	–
হাতে নগদ	২,০০০.০০	–
ব্যাংকে জমা	৬,০০০.০০	–
	৮৫,০০০.০০	৮৫,০০০.০০

সমন্বয় : সমাপনী মজুদ ২০,০০০ টাকা

সমাধান :

জনাব হাসিবুল কাইয়ুম
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের ক্রয়–বিক্রয় এবং লাভ–লোকসান হিসাব

ডেবিট **ক্রেডিট**

বিবরণ	পরিমাণ	বিবরণ	পরিমাণ
টু মজুদ (১–১–৯৯)	১০,০০০.০০	বাই বিক্রয় ৩০,০০০.০০	–
” ক্রয় ২৩,০০০.০০		বাদ ফেরত (–) ৩,০০০.০০	২৭,০০০.০০
বাদ ফেরত (–) ৩,০০০.০০	২০,০০০.০০	সমাপনী মজুদ	২০,০০০.০০
” মজুরি	১,৫০০.০০		
” পরিবহণ	৫,০০০.০০		
” মোট লাভ (লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তরিত	১০,৫০০.০০		
	৪৭,০০০.০০		৪৭,০০০.০০
টু বেতন	২,৫০০.০০	বাই মোট লাভ (ক্রয়–বিক্রয় হিসাব থেকে স্থানান্তরিত)	১০,৫০০.০০
” বাড়ি ভাড়া	২,৩০০.০০		
” বীমা সেলামী	১,৪০০.০০		
” বিজ্ঞাপন খরচ	১,৩০০.০০		
” নীট লাভ (মূলধন হিসাবে স্থানান্তরিত)	৩,০০০.০০		
	১০,৫০০.০০		১০,৫০০.০০

জনাব হাসিবুল কাইয়ুম
উদ্বর্তপত্র
১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে

দায়সমূহ		পরিমাণ (টাকা)	সম্পদ	পরিমাণ (টাকা)
পাওনাদার		২,০০০.০০	হাতে নগদ	২,০০০.০০
মূলধন	৫০,০০০.০০		ব্যাংকে জমা	৬,০০০.০০
যোগ নীট লাভ	৩,০০০.০০		দেনাদার	৫,০০০.০০
	৫৩,০০০.০০			
বাদ উত্তোলন	১৩,০০০.০০	৪০,০০০.০০	সমাপনী মজুদ	২০,০০০.০০
			আসবাবপত্র	৫,০০০.০০
			সাজসরঞ্জাম	৪,০০০.০০
		৪২,০০০.০০		৪২,০০০.০০

মুনাফা পরিকল্পনা

ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। অগ্রগতি ও টিকে থাকার জন্য মুনাফা অর্জন একান্তভাবে অপরিহার্য। এ জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত তার ব্যবসায়ের জন্য একটি মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। পরিকল্পনাবিহীনভাবে ব্যবসায় চালালে ব্যবসায়ের কাঙ্ক্ষিত লাভ অর্জন সম্ভব হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তাই ব্যবসায়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুনাফা এমনিতে অর্জিত হয় না। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। মুনাফা বলতে ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের ব্যবধানকে বুঝায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে লক্ষ্য স্থির করে উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মসূচি বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। ব্যবসায় শুরুর দিকে মুনাফা কম হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে যেমন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে, বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়িয়ে, উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন।

মুনাফা বৃদ্ধি করার যেসব কৌশল প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফা সম্পর্ক বিশ্লেষণ অন্যতম। এ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অনেকটা সহজ। আমরা জানি, উৎপাদনের বা ব্যবসায়ের ব্যয়কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রত্যক্ষ ব্যয় ও পরোক্ষ ব্যয়। অন্যভাবে ব্যয়সমূহকে পরিবর্তনশীল ব্যয় ও স্থায়ী ব্যয় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। বিক্রয় ও উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হলেও স্থায়ী ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয় বিক্রয় ও উৎপাদনের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বুঝানো যেতে পারে। মনে কর, একটি জুতার দোকানে প্রতি সপ্তাহে ১,০০০ জোড়া জুতা বিক্রয় হয়। প্রতি জোড়া ৮০ টাকা হারে ১,০০০ জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৮০,০০০ টাকা। দোকান ভাড়া, কর্মচারি ও বিদ্যুৎ খরচ বাবদ সপ্তাহে ঐ দোকানে স্থায়ী খরচের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। স্থায়ী খরচসহ প্রতি জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য পড়ে ৯০ টাকা। ফলে ১০০০ জোড়া জুতার মোট ক্রয় মূল্য ৯০,০০০ টাকা। যদি প্রতি জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা হয় তাহলে সপ্তাহে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১,০০,০০০ টাকা। এক্ষেত্রে সপ্তাহে অর্জিত মুনাফার পরিমাণ হবে (১,০০,০০০-৯০,০০০)=১০,০০০ টাকা অর্থাৎ জোড়া প্রতি মুনাফা ১০ টাকা। যদি সপ্তাহে ১০২০ জোড়া জুতা বিক্রয় করা যায় তাহলে মুনাফা কত হবে? অতিরিক্ত ২০ জোড়া জুতার মূল্য (২০x৮০ টাকা) ১,৬০০ টাকা। সুতরাং ১০২০ জোড়া জুতার ক্রয় মূল্য হবে (১০২০x৮০ টাকা) ৮১,৬০০ টাকা + ১০,০০০ = ৯১,৬০০ টাকা। প্রতি জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা হিসাবে ১০২০ জোড়া জুতার বিক্রয় মূল্য হবে ১,০২,০০০ টাকা। এতে সপ্তাহে মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে (১,০২,০০০-৯১,৬০০) = ১০,৪০০ টাকা। ফলে জোড়া প্রতি মুনাফার পরিমাণ হবে প্রায় ১০ টাকা ২০ পয়সা।

এখানে লক্ষ করা প্রয়োজন বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়লেও স্থায়ী খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।, কারণ ২০ জোড়া জুতা বেশি বিক্রি হলে দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ ও কর্মচারির বেতন একই থাকবে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে উৎপাদন বা বিক্রয়ের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে সাধারণত স্থায়ী খরচের পরিমাণের পরিবর্তন হয় না। উৎপাদন বা বিক্রয় যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে একক প্রতি পণ্যের উপর স্থায়ী ব্যয় ততই হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের বা বিক্রয়ের পরিমাণ কমতে থাকলে স্থায়ী ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে পরিবর্তনশীল ব্যয় সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (Break Even Analysis)

সম আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ বলতে ব্যবসায়ের এমন একটি অবস্থাকে নির্দেশ করে যে অবস্থায় আয়-ব্যয় সমান হয়। একে সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণও বলা হয়ে থাকে। অন্য কথায় বলা যায় এটি ব্যবসার এমন একটি পর্যায় যখন লাভ ও হয় না, ক্ষতিও হয় না। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে মোট বিক্রয় মূল্য মোট ব্যয়ের সমপরিমাণ হবে তাকে সম আয়-ব্যয় বলে।

যে বিন্দুতে পণ্য বিক্রয় করলে আয় ও ব্যয় সমান হয় তাকে সম আয়-ব্যয় বিন্দু (Break Even Point) বলে। সুতরাং সম আয়-ব্যয় বিন্দু বলতে উৎপাদন বা বিক্রয়ের এমন একটি পরিমাণকে বুঝায়, যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লাভও বুঝায় না, লোকসানও বুঝায় না।

সম আয়–ব্যয় বিন্দু জানা থাকলে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের আশায় পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মুনাফা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বোপরি মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপাত্তের মধ্যে স্থায়ী ব্যয়, একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়, একক প্রতি বিক্রয় মূল্য, বিক্রয়কৃত পণ্যের পরিমাণ, ক্রয়কৃত ও উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ প্রভৃতি প্রধান। প্রয়োজনীয় উপাত্ত পাওয়া গেলে সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের সাহায্যে সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের করা যায়। সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের করার সূত্র হলো :

$$\text{সম আয়–ব্যয় বিন্দু} = \frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয় (FC)}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য (SP)} - \text{একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় (UVC)}}$$

চিত্র :

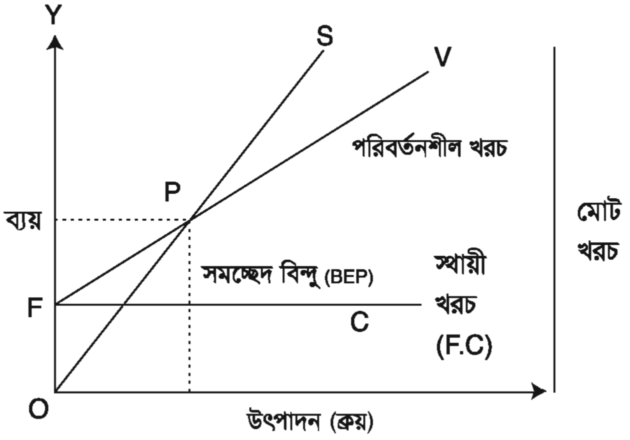

সমচ্ছেদ বিন্দু/সম আয়–ব্যয় বিন্দু

FC=Fixed Cost
SP=Selling Price
UVC=Unit Variable Cost

ব্যাখ্যা : সম আয়–ব্যয় বিন্দু বা সমচ্ছেদ বিন্দু চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। এখানে তেমনি একটি চিত্র দেয়া হয়েছে। এখানে–

OX রেখা=উৎপাদন
OY রেখা=ব্যয়
FC রেখা=স্থায়ী খরচ (Fixed Cost)
FV বিন্দু=পরিবর্তনশীল খরচ(Variable Cost)
S রেখা=মোট বিক্রয় (Total Sales)
P বিন্দু=সমচ্ছেদ বিন্দু/সম আয়–ব্যয় বিন্দু

চিত্রে বিক্রয় রেখার যে বিন্দুতে খরচ রেখা ছেদ করেছে (P বিন্দু) সেটিই হল সমচ্ছেদ বিন্দু বা সম আয়–ব্যয় বিন্দু।

উদাহরণ–১

জনাব আবদুল বাতেন একজন দক্ষ পিজা প্রস্তুতকারক। সে হিসাব করে দেখেছে একটি বড় সাইজের পিজা প্রস্তুত করতে খরচ পড়ে ৪০ টাকা যা বর্তমানে বাজারে ৫০ টাকায় বিক্রয় করা সম্ভব। পিজা বিক্রয় করার জন্য সে যে দোকান ভাড়া নেবে তাতে ব্যয় হবে ৫,০০০ টাকা। সম আয়–ব্যয় অবস্থার জন্য কয়টি পিজা বিক্রয় করতে হবে?

উত্তর : এ অঙ্কে নিম্নোক্ত উপাত্তগুলো বিদ্যমান

একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়	= ৪০ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয়	= ৫,০০০ টাকা
একক প্রতি বিক্রয় মূল্য	= ৫০ টাকা

সূত্র অনুযায়ী :

$$\text{সম আয়–ব্যয় বিন্দু} = \frac{৫,০০০}{৫০-৪০}$$

$$= \frac{৫,০০০}{১০}$$

$$= ৫০০$$

উত্তর = ৫০০ টি পিজা

উদাহরণ–২

নিচে শামীম এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে সম আয়–ব্যয় বিন্দু বের কর।

প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য = ৫ টাকা
মোট স্থায়ী ব্যয় = ১০,০০০ টাকা
পরিবর্তনশীল একক পণ্যের ব্যয় = ৩ টাকা

সূত্র অনুসারে :

সম আয়–ব্যয় বিন্দু = $\frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য (–) একক পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

মান বসিয়ে = $\frac{১০,০০০}{৫–৩}$

= $\frac{১০,০০০}{২}$

= ৫,০০০ ইউনিট।

যদি শামীম স্থায়ী খরচের উপর ৪০% মুনাফা অর্জন করতে চায় তাহলে মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ টাকা। কাঙ্ক্ষিত মুনাফা ৪,০০০ টাকা অর্জন করতে কত ইউনিট মাল বিক্রয় করা প্রয়োজন?

সূত্র = $\frac{\text{স্থায়ী খরচ + কাঙ্ক্ষিত মুনাফা}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য–একক প্রতি পরিবর্তনশীল খরচ}}$

মান বসিয়ে = $\frac{১০,০০০ + ৪,০০০}{৫–৩}$

= $\frac{১৪,০০০}{২}$

= ৭,০০০ ইউনিট।

৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে হলে প্রতি ইউনিট ৫ টাকা হিসেবে ৭,০০০ ইউনিট বিক্রয় করতে হবে।

যদি এমন হয়, ৬,৫০০ ইউনিট বিক্রয় করে ৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে হবে, তাহলে একক টাকা প্রতি বিক্রয় মূল্য কত নির্ধারণ করা যেতে পারে?

বিক্রয় মূল্য = $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়+কাঙ্ক্ষিত মুনাফা}}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ (ইউনিট)}}$

মান বসিয়ে = $\frac{১০,০০০ + ৪,০০০}{৬,৫০০}$

= $\frac{১৪,০০০}{৬,৫০০}$

= ২.১৫ টাকা।

তা হলে প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য = ২.১৫ + ৩.০০ = ৫.১৫ টাকা।

প্রতিটি পণ্য ৫ টাকার পরিবর্তে ৫.১৫ টাকায় বিক্রয় করতে পারলে ৪,০০০ টাকা মুনাফা অর্জন করা যাবে।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, একজন শিল্পোদ্যোক্তা সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি বা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ পূর্বেই স্থির করে ব্যবসায়ের কাজ পরিচালনা করতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. হিসাবরক্ষণের মূল ভিত্তি কী ?

ক. জাবেদা খ. খতিয়ান

গ. ক্যাশ বই ঘ. লেনদেন

২. সম আয়–ব্যয় বিশ্লেষণ মুনাফা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। নিচের কোনটি সম আয়–ব্যয় বিন্দুর সূত্র ?

i. $\frac{\text{ক্রয় মূল্য + বিক্রয় মূল্য}}{\text{নীটমূল্য}}$

ii. $\frac{\text{ক্রয় মূল্য + বিক্রয় মূল্য}}{\text{মোট মূল্য x নীট মূল্য}}$

iii. $\frac{\text{মোট স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক বিক্রয় মূল্য – একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয়}}$

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব আলী একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন নগদে ও বাকিতে লেন-দেন করেন এবং দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। তিনি বছর শেষে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করেন।

৩. ব্যবসায়ের জীবন কোনটি ?

ক. দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি খ. হিসাব

গ. মূলধন ঘ. ক্রয় ও বিক্রয়

৪. হিসাব রক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

ক. হিসাব রাখা খ. লেনদেনগুলো সংরক্ষণ করা

গ. ক্রয় বিক্রয় করা ঘ. আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

জনাব হাসান একজন ব্যবসায়ী। তিনি দু তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। ব্যবসায়ের নগদ লেনদেনগুলো তারিখের ক্রমানুসারে তিনি নগদান বইয়ে সংরক্ষণ করেন। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নিম্নলিখিত লেন-দেনগুলো সম্পন্ন হয় :

২০০৬ সালের	জানুয়ারি	১	হাতে নগদ	২০,০০০/−
”	জানুয়ারি	২	নগদে বিক্রয়	১,৫০০/−
”	জানুয়ারি	৪	নগদে মাল ক্রয়	২,০০০/−
”	জানুয়ারি	৫	বেতন প্রদান	২,৫০০/−
”	জানুয়ারি	৮	ব্যাংক থেকে উত্তোলন	৩,০০০/−
”	জানুয়ারি	১৫	বাবরকে নগদ প্রদান	৫০০/−
”	জানুয়ারি	২৫	হামিদের কাছ থেকে প্রাপ্তি	২,৮০০/−
”	জানুয়ারি	৩০	ঘর ভাড়া পরিশোধ	১,০০০/−

ক. ক্যাশ বই কী?

খ. ব্যবসায়ের ক্যাশ বই গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

গ. জনাব হাসানের উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো নগদান বইতে লিপিবদ্ধ কর।

ঘ. নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায় ৯

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ

অধ্যায় সূচি :

১. খরচের প্রকারভেদ
২. ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণ
৩. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী
৪. উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য
৫. বিভিন্ন খরচের ব্যাখ্যা
৬. অনুশীলন
৭. অনুশীলনের ধাপসমূহ
৮. শিক্ষকের করণীয়
৯. প্রশ্নাবলি

ব্যবসার প্রধান উপাদান হল এর পণ্য বা দ্রব্য। সাধারণ কেনা–বেচা ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যবসায়ের বেলায় উৎপাদন ব্যয়ের কথা জানি। যে কোন ব্যবসায়ীর জন্য পণ্যের যথার্থ ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় যথাযথভাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়। ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের কাজ আগেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় এবং বিক্রয় মূল্য নিরূপণ পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

খরচের প্রকারভেদ : খরচ দুই প্রকার যথা–

১। প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Cost)

২। পরোক্ষ খরচ (Indirect Cost)

১। প্রত্যক্ষ খরচ : যে খরচ পণ্য ক্রয় বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত এবং ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সহজে আরোপ করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন, পণ্য–ক্রয়, পণ্যের পরিবহন খরচ, ইত্যাদি।

২। পরোক্ষ খরচ : যে খরচ পণ্য ক্রয় খরচ বা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় এবং ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত দ্রব্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা যায় না তাকে পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন–ঘরভাড়া, বেতন, কমিশন, স্টেশনারি, অফিস খরচ, মেরামত খরচ, টেলিফোন বিল ইত্যাদি।

ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণ

কেনা–বেচা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের জন্য যে দাম দেয়া হয় তাকেই ক্রয় মূল্য বলে। প্রকৃত অর্থে পণ্যের দাম এবং পণ্য কিনে বিক্রয় স্থলে বা দোকানে পৌঁছানো পর্যন্ত খরচ ক্রয় মূল্যের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে মালের পরিবহন খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি যোগ করে ক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়।

ক্রয়মুল্যের সাথে ব্যবসায়ের পরোক্ষ আনুষঙ্গিক খরচ, যেমন–দোকান ভাড়া, কর্মচারির বেতন, যাতায়াত খরচ ইত্যাদি যোগ করে পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পণ্যের মোট ক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়। যদি একটি ব্যবসায় এক বা একাধিক পণ্য কেনা বেচা করা হয়, তাহলে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে পরোক্ষ খরচগুলো আনুপাতিক হারে যোগ করে প্রত্যেক পণ্যের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়।
পণ্যের ক্রয় মূল্য, মোট ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নিচের তালিকার সাহায্যে দেখানো যায় :

পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত মূল্য +	– – –
প্রত্যক্ষ খরচ	– – –
(পরিবহণ খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি)	– – –
মুখ্য খরচ +	– – –
পরোক্ষ খরচ	
(ঘর ভাড়া, বেতন, টেলিফোন বিল ইত্যাদি)	– – –
মোট ক্রয় মূল্য	
যোগ মুনাফা (মনে কর মোট ক্রয় মূল্যের উপর ২০%	– – –
বিক্রয় মূল্য	– – –

একটি উদাহরণ দেয়া যাক : একজন ব্যবসায়ী প্রতি টিন ১০০ টাকা করে ৫০ টিন গুঁড়া দুধ ক্রয় করল। টিন প্রতি ২ টাকা কুলির মজুরি, ১০ টাকা পরিবহন খরচ এবং ৫ টাকা কর পরিশোধ করল। এ ক্ষেত্রে প্রতি টিন গুঁড়া দুধে প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য = ১০০+২+১০+৫+=১১৭ টাকা। ৫০টি টিনের প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য হবে ১১৭ টা X ৫০=৫,৮৫০ টাকা।

ঐ ব্যবসায়ীর দোকান ভাড়া ও কর্মচারির বেতন বাবদ ১,০০০ টাকা ধরা হলে ৫০ টিন গুঁড়া দুধের মোট ক্রয় মূল্য দাঁড়াবে ৫,৮৫০ + ১,০০০ = ৬,৮৫০ টাকা। মোট ক্রয় মূল্যের উপর ২০% মুনাফা ধরলে ৫০ টিন গুঁড়া দুধের বিক্রয় মূল্য হবে ৬,৮৫০+১,৩৭০=৮,২২০ টাকা।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

গুঁড়া দুধ ক্রয়	
প্রতিটিন ১০০ টাকা হিসাবে ৫০ টিন	৫০০০ টাঃ
+ মজুরি প্রতিটিন ২ টাকা হিসাবে	১০০ টাঃ
+পরিবহন খরচ	
প্রতিটিন ১০ টাকা হিসাবে ৫০ টিন	৫০০ টাঃ
+ কর পরিশোধ	
প্রতিটি ৫ টাকা হিসাবে	২৫০ টাঃ
মুখ্য খরচ/প্রত্যক্ষ খরচ	৫,৮৫০ টাঃ
দোকান ভাড়া ও কর্মচারির বেতন	১,০০০ টাঃ
মোট ক্রয় মূল্য	৬,৮৫০ টাঃ
+মুনাফা (ক্রয়ের ওপর ২০%)	১,৩৭০ টাঃ
বিক্রয় মূল্য	৮,২২০ টাঃ

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য

যে দ্রব্য কারখানায় তৈরি হয় এবং এতে যে খরচ হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলে। যেমন ইট তৈরি কারখানায় ইট তৈরি করতে যে খরচ হয় তাই ইটের উৎপাদন ব্যয়, আসবাবপত্র তৈরি কারখানায় আলমারি তৈরি করতে যে খরচ হয় তাই আলমারির উৎপাদন ব্যয়। উৎপাদন ব্যয়কে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–কাঁচামালের খরচ, মজুরি খরচ ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ। এগুলোকে উৎপাদন ব্যয়ের উৎপাদান বলা হয়। উৎপাদন ব্যয়কে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ ব্যয়কে পুনরায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা–(১) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, (২) প্রত্যক্ষ মজুরি, (৩) প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ। একইভাবে পরোক্ষ ব্যয়সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা–(১) কারখানা ব্যয় (২) অফিসের ব্যয় (৩) বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচের যোগফলকে মুখ্য ব্যয় বলে। মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার পরোক্ষ খরচের যোগফলকে কারখানার ব্যয় এবং কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস খরচের যোগফলকে উৎপাদন ব্যয় বলে। মুখ্য ব্যয়ের সাথে কারখানার পরোক্ষ খরচের যোগফলকে কারখানার ব্যয় এবং কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস খরচের যোগফলকে উৎপাদন ব্যয় বলে। উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ যোগ করে মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয়। মোট ব্যয়ের সাথে লাভ যোগ করে বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করা হয়।

উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি নিচে ছকের মাধ্যম দেখানো হল।

প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ক্রয়	– – –
পরিবহণ খরচ	– – –
মজুরি	– – –
মুখ্য ব্যয়+	**– – –**
কারখানার পরোক্ষ ব্যয়	

(কারখানার কর্মচারির বেতন, কারখানার	– –– –
ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ	– –– –
জ্বালানি প্রভৃতি)	– –– –
কারখানা ব্যয় +	**– –– –**
অফিস ও প্রশাসনিক বেতন	– – ––
(অফিসের কর্মচারিদের বেতন,	-----
অফিসের ভাড়া, মনিহারি খরচ,	-----
ডাক তার টেলিফোন ইত্যাদি)	-----
উৎপাদন ব্যয় +	
বিক্রয় কেন্দ্রে উৎপাদিত	
পণ্য পৌঁছানোর	
পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ,	-----
বিক্রয় কর্মচারিদের বেতন,	-----
কমিশন ইত্যাদি	-----
মোট উৎপাদন ব্যয়	**-----**
যোগ মুনাফা (মনে কর মোট	
উৎপাদন ব্যয়ের ২৫%)	-----
বিক্রয় মূল্য	-----

বিভিন্ন খরচের ব্যাখ্যা

১। **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল :** যে কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় এবং যা উৎপাদিত পণ্যের সাথে চিহ্নিত করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বলে, যেমন– কাপড়ের মিলের সুতা, কাঠের ফার্নিচারের জন্য কাঠ, চামড়া কারখানার জন্য চামড়া, ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ইট, সুরকি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কাঁচামালের উদাহরণ।

২। **প্রত্যক্ষ মজুরি :** সরাসরি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন–কাঠ মিস্ত্রির মজুরি, দালান নির্মাণে রাজমিস্ত্রির মজুরি, পাটের কলে শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ মজুরির উদাহরণ।

৩। **প্রত্যক্ষ খরচ :** কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরি ছাড়াও এমন খরচ আছে, যা উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ বলে। যেমন– কাঁচামাল পরিবহন, কর খরচ ইত্যাদি।

৪। **কারখানার খরচ :** প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, মজুরি ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়াও কারখানার যাবতীয় খরচকে কারখানার পরোক্ষ খরচ বলে। যেমন– কারখানার কর্মচারীর বেতন, কারখানার ভাড়া, বিদ্যুৎ খরচ, মেশিনের মেরামত খরচ, জ্বালানি ব্যয় ইত্যাদি।

৫। **অফিসের ব্যয় :** অফিস পরিচালনা বাবদ যাবতীয় ব্যয়কে অফিস ব্যয় বলে। যেমন– অফিসের কর্মচারিদের বেতন, অফিসের ভাড়া, মনিহারি খরচ, ডাক, তার, টেলিফোন খরচ ইত্যাদি।

৬। **বিক্রয় খরচ :** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য যে খরচ হয় তাকে বিক্রয় খরচ বলে। যেমন–বিক্রয় কেন্দ্রে নেয়ার জন্য উৎপাদিত পণ্যের পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ, বিক্রয়, কর্মচারিদের বেতন, মাল বিতরণ খরচ ইত্যাদি।

একটি উদাহরণ

একজন আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর ২০০টি আলমারি
তৈরি করতে নিম্নোক্ত খরচ হয়

		টাকা
কাঠ খরচ	–	২০,০০০.০০
মিস্ত্রির মজুরি	–	৮,০০০.০০
কাঠ আনার পরিবহণ খরচ	–	১০,০০০.০০
আলমারি তৈরির অন্যান্য খরচ	–	৩,০০০.০০
কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০
ভ্যাট	–	১,০০০.০০
বিক্রয়ের জন্য আলমারি দোকানে আনার খরচ	–	১,০০০.০০
মনিহারি, ডাক, টেলিফোন	–	১,০০০.০০
অফিস কর্মচারির বেতন	–	৪,০০০.০০
বিক্রয় কর্মীর বেতন	–	১,০০০.০০
দোকান ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০

২০০টি আলমারির মুখ্য ব্যয়, উৎপাদন ব্যয় ও মোট ব্যয় বের কর। মোট ব্যয়ের উপর শতকরা ২৫ টাকা লাভে আলমারি বিক্রয় করলে প্রতিটির মূল্য কত?

সমাধান :

২০০ টি আলমারির উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

		টাকা
কাঠ ক্রয়	–	২০,০০০.০০
কাঠ আনার গাড়ি ভাড়া	–	১,০০০.০০
মিস্ত্রির মজুরি	–	৮,০০০.০০
ভ্যাট	–	১,০০০.০০
অন্যান্য সামগ্রী ব্যয়	–	৩,০০০.০০
মুখ্য ব্যয়	–	৩৩,০০০.০০
কারখানার ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	–	২,০০০.০০

	টাকা	টাকা
কারখানা ব্যয়	–	৩৫,০০০.০০
অফিস কর্মচারির বেতন	৪,০০০.০০	–
মনিহারি, ডাক ও টেলিফোন	১,০০০.০০	–
		৫,০০০.০০
মোট উৎপাদন ব্যয়		৪০,০০০.০০
দোকানে আলমারি আনার ভাড়া	১,০০০.০০	
বিক্রয় কর্মীর বেতন	১,০০০.০০	
দোকান ভাড়া ও বিদ্যুৎ খরচ	২,০০০.০০	
	....	৪,০০০.০০
মোট ব্যয়		৪৪,০০০.০০
যোগ ২৫% মুনাফা : মোট ব্যয়ের উপর		১১,০০০.০০
বিক্রয় মূল্য		৫৫,০০০.০০

প্রতিটি আলমারির তৈরি খরচ : ৪৪,০০০.০০ ÷ ২০০=২২০ টাকা
প্রতিটি আলমারির বিক্রয় মূল্য : ৫৫,০০০.০০ ÷ ২০০=২৭৫ টাকা

অনুশীলন

বিষয় : খাম উৎপাদন খেলা

উদ্দেশ্য

এ খেলা শেষে শিক্ষার্থীরা একটি প্রকল্পের সংগঠন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

সময় : ২ $\frac{১}{২}$ – ৩ ঘণ্টা।

উপকরণ :

১। ছোট খাম–১ ডজন (এর মধ্যে ৬টি খাম পানি দিয়ে ভিজিয়ে সম্পূর্ণভাবে খুলে নিতে হবে)
২। ডুপ্লিকেটিং পেপার– প্রয়োজনমত
৩। কাঁচি
৪। আঠা বা আইকা
৫। স্কেল
৬। পেন্সিল
৭। ছুরি
৮। আর্ট পেপার (মোটা)
৯। চেয়ার, টেবিল (পরিমাণমত)
১০। বোর্ড, চক
১১। চুক্তিপত্র ও মূল্য তালিকা
১২। ঝুঁড়ি

অনুশীলনের ধাপসমূহ

১ম ধাপ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কিছু খাম উৎপাদন করে সরবরাহ করবে। এ কাজ পরিকল্পনা করার জন্য সময় দেয়া হবে ১৫ মিনিট। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ঘরভাড়া ও কাঁচামালের দাম নিম্নলিখিত হারে নগদ টাকায় পরিশোধ করবেন এবং এ সময়ের মধ্যে কয়টি খাম সরবরাহ করতে পারবে তা চুক্তিপত্র করে নেবে। চুক্তি ও নমুনা অনুযায়ী সরবরাহ করতে পারলে একটি খামের জন্য ২ টাকা হারে পাবে। সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে প্রতিটি খামের জন্য .৫০ টাকা হারে নগদ টাকায় জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

অর্ডার ফরম

যন্ত্রপাতি ভাড়া

সংখ্যা	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য / টাকা	মোট মূল্য / টাকা
১।	আঠা		২.০০	
২।	ডাইস (টেম্পলেট)		২.০০	
৩।	টেবিল		২.০০	
৪।	চেয়ার		২.০০	
৫।	কাঁচি		২.০০	
৬।	স্ট্যাপলার		২.০০	
৭।	স্কেল		১.০০	
৮।	রুমের ভাড়া		১.০০	
৯।	বিদ্যুৎ		১.০০	
১০।	পেন্সিল/রবার		১.০০	
১১।	আর্ট পেপার		১.০০	
১২।	কাঁচামাল (প্রতি দশ পিস কাগজ)		১.০০	
	মোট			

দলনেতার স্বাক্ষর

পণ্য সরবরাহের চুক্তিপত্র

আমরা এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আপনাদের প্রেরিত নমুনা মোতাবেক (আপনার অনুমোদন সাপেক্ষে) সমমানের .... টি খাম নির্ধারিত ৪০ মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করব।

বাতিলকৃত ও অসরবরাহকৃত পণ্যের জন্য জরিমানা দিতে আমরা বাধ্য থাকব।

স্বাক্ষর

....

(কোম্পানির প্রতিনিধি)

কোম্পানির নাম ....

স্বাক্ষর ....

(ক্রেতা)

২য় ধাপ :

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হবে এবং প্রতি দল একজন ব্যবস্থাপক/পরিচালক নির্বাচন করবে।

৩য় ধাপ :

প্রত্যেক দল ১৫ মিনিট ধরে পরিকল্পনা করবে। পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। নির্ধারিত সময়ে (৪০ মি.) কতগুলো খাম উৎপাদন করে সরবরাহ করবে।

- উৎপাদনের জন্য কী কী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লাগবে। (ঘর ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল সবার জন্য থাকবে)।
- উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচের টাকা সবাই সমানভাবে ভাগ করে ব্যবস্থাপক/পরিচালকের হাতে দেবে।
- ব্যবস্থাপক/পরিচালক মূল্য তালিকা পূরণ করে চুক্তিপত্রে সই করবে।
- পরিকল্পনার সময় যদি কোনো দলের কোনো কিছুর (নমুনা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদি) দরকার হয় তাহলে বিনামূল্যে ব্যবস্থাপক পরিচালক/শিক্ষকের কাছ থেকে গোপনে নিতে পারবে।

৪র্থ ধাপ :

মূল্য তালিকা ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রতি দল শিক্ষকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মালামাল বুঝে নিয়ে দাম পরিশোধ করবে।

৫ম ধাপ :

প্রতিটি দল খাম উৎপাদন করবে। উৎপাদন শেষে উৎপাদিত খাম ও যন্ত্রপাতি শিক্ষককে বুঝিয়ে দেবে।

৬ষ্ঠ ধাপ :

উৎপাদিত খামের মান নিয়ন্ত্রণের পর যদি দেখা যায় যে, কোনো দল লাভ করতে পারেনি তবে আবার সব দলই খাম বানানোর সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও উৎপাদনের সময় কম পাবে। দ্বিতীয় বার উৎপাদনের সময় যন্ত্রপাতির কোনো ভাড়া দিতে হবে না। তবে শুধু কাঁচামালের দাম ও ঘরভাড়া এবং বিদ্যুৎ খরচ দিতে হবে।

শিক্ষকের করণীয়

পরিকল্পনার সময় প্রত্যেক দলের প্রত্যেকের ভূমিকা যেমন– আলোচনায় অংশগ্রহণ, নমুনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, পরীক্ষামূলক উৎপাদন, ৪০ মিনিটে কতগুলো খাম বানানো যায়, নির্ধারিত সময়ের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নোট রাখবেন।

উৎপাদনের সময় দেখবেন যে–

- মান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কি না
- পরিচালক কাজের তত্ত্বাবধান করছেন কি না
- পরিচালক সকলের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিচ্ছেন কি না
- প্রয়োজনীয় উপকরণাদি বিতরণের পর নিম্নলিখিত ছকটি বোর্ডে আঁকবেন এবং পর্যায়ক্রমে তা পূরণ করবেন।

দলের নাম	অর্ডারকৃত মাল	সরবরাহকৃত মাল	ক্রয়কৃত পণ্য	জরিমাণা	উৎপাদন খরচ	বিক্রয় মূল্য	লাভ	লোকসান

- উৎপাদনের পর একে একে প্রত্যেক দলের সরবরাহকৃত খাম প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী হল কি না তা যাচাইয়ের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ করবেন।
- সরবরাহকৃত খাম কতগুলো গ্রহণ করা হল, কতগুলো খাম সরবরাহ হয়নি তার ভিত্তিতে উল্লিখিত ছক পূরণ করে লাভ–লোকসানের হিসাব বের করবেন।
- যে দল সবচেয়ে বেশি লোকসান/কম লাভ করেছে সে দলের কাছ থেকে লোকসানের কারণ জেনে নিয়ে বোর্ডে লিখবেন।
- যে দল সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে সে দলের লাভ করার কারণ জেনে বোর্ডে লিখবেন।
- অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রাপ্ত তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মোট ক্রয়মূল্যের সাথে ব্যবসায়ের মুনাফা যোগ দিলে পাওয়া যায় ?

ক. প্রত্যক্ষ ক্রয় মূল্য
খ. পরোক্ষ ক্রয় মূল্য
গ. মোট ক্রয় মূল্য
ঘ. মোট বিক্রয় মূল্য

২. কীভাবে মুনাফা বৃদ্ধি করা যায় ?

i. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে
ii. বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

সখিপুর গ্রামের মানিক মিয়ার ২০০টি পণ্য দ্রব্য উৎপাদনের খরচের ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ :

কাঁচামাল ক্রয়	১২,০০০/–
শ্রমিকের মজুরি	৮,০০০/–
কারখানার ভাড়া	৬,০০০/–
অফিস খরচ	৫,০০০/–
বিক্রয় খরচ	৪,০০০/–

৩. **কাঁচামালের ব্যয় কোন খরচের অন্তর্ভুক্ত ?**

ক. প্রত্যক্ষ খরচ
খ. পরোক্ষ খরচ
গ. কারখানার খরচ
ঘ. বিক্রয় খরচ

৪. **মানিক মিয়ার ২০০টি উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে –**

ক. ৯,০০০ টাকা
খ. ১৪,০০০ টাকা
গ. ২০,০০০ টাকা
ঘ. ৩৫,০০০ টাকা।

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সখিপুর গ্রামের মানিক মিয়া একজন ব্যবসায়ী। তিনি উৎপাদন শুরুর আগেই তার উৎপাদিত পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং উৎপাদন ব্যয় নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন করেন। তিনি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে পাইকারি বিক্রয় করেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে তার কারখানায় ২০০টি দ্রব্য উৎপাদন করেন।

যার ব্যয় নিম্নরূপ :

কাঁচামাল ক্রয়	–	১২,০০০ টাকা,
প্রত্যক্ষ মজুরি	–	৮,০০০ টাকা,
কারখানার পরোক্ষ ব্যয়	–	৩০,০০০ টাকা,
অফিস খরচ	–	২০,০০০ টাকা,
বিক্রয় খরচ	–	২০,০০০ টাকা।

ক. খরচ কত প্রকার ?

খ. অনুচ্ছেদটিতে বর্ণিত যে কোনো একটি ব্যয় ব্যাখ্যা কর।

গ. মানিক মিয়ার ২০০টি দ্রব্য তৈরির একটি ব্যয় বিবরণী তৈরি কর এবং ২০% লাভে বিক্রয় মূল্য বের কর।

ঘ. "উৎপাদন ও ব্যবসায় শুরু করার আগেই পণ্যের ক্রয় মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ আবশ্যক"–উক্তিটি কতটুকু যথাযথ তা ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায় ১০

ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

অধ্যায় সূচি

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
২. পরিদর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
৩. প্রতিবেদন
৪. প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু
৫. নির্ঘণ্ট
৬. গ্রন্থ বিবরণী,
৭. পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান লাভের পর সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রক্রিয়াকে পরিদর্শন বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হলে সশরীরে সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত। হাজির হওয়ার পর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারিদের সাথে প্রত্যক্ষ আলাপ–আলোচনায় অনেক প্রকৃত তথ্য জানা সম্ভব হয়। এ ছাড়া নিজের চোখে অনেক কিছু দেখেও জ্ঞান আহরণ করা যায়।
কাজেই এ কথা বলা যায় যে, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শিক্ষার পূর্ণতা আনয়নে সহায়তা করে। পরিদর্শন সুশৃঙ্খলভাবে ও পর্যায়ক্রমে হওয়া উচিত। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত লিখে নেয়া উচিত, যাতে প্রতিবেদন প্রণয়নে কোনো অসুবিধা না হয়।

পরিদর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ছাত্র–ছাত্রীদের আবার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন কী? তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের সাথে সাথে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করলে তাতে তাদের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উভয় জ্ঞানের সমন্বয়েই শিখন সার্থক হয়। কাজেই সেদিক থেকে ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নে কতিপয় পয়েন্টে পরিদর্শনের গুরুত্ব উল্লেখ করা হল :

১. প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচিত হওয়া যায়
২. এর অবস্থান ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায়
৩. এর কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি অবহিত হওয়া যায়
৪. মালিক ও কর্মচারিদের মনোভাব জানা যায়
৫. তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়
৬. তারা কীভাবে এগুলোর সমাধান করছে তা জানা যায়
৭. ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়
৮. নিজে ভবিষ্যতে এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে
৯. আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় ইত্যাদি

প্রতিবেদন

ব্যবসায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনের পর অর্জিত জ্ঞানের আলোকে একটি প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদনটির একাধিক কপি তৈরি করতে হয়। কারণ শিক্ষকও প্রতিষ্ঠানকে ১ (এক) কপি করে জমা দেয়ার পর নিজের কাছেও এক কপি রাখা প্রয়োজন। পরিদর্শনের পরে সংগৃহীত উপাত্ত ও তথ্য এবং অর্জিত জ্ঞান একত্রিত করে লিখিতভাবে যে বিবরণী দাখিল করা হয় তাকে প্রতিবেদন বলে।

প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু

প্রতিবেদন লেখার সময় এর বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, বিষয়বস্তুর ওপর প্রতিবেদন প্রণয়নের সার্থকতা নির্ভর করে। বিষয়বস্তু ধারাবাহিক ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রতিবেদনের সূচি বা বিষয়বস্তু পরিদর্শনের উদ্দেশ্যের উপরেও নির্ভর করে। কাজেই পরিদর্শন আরম্ভ করার সময়েই এ ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়। পরিদর্শনের পূর্বেই লিখিত আকারে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা উচিত। এর ফলে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ফলপ্রসূ হয়। বিষয়বস্তুকে প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিতে হয়। প্রতিবেদনের মধ্যে প্রধানত যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ থাকে তা নিম্নরূপ:

১. ভূমিকা

এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন:

ক. পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব
খ. প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসহ)
গ. জাতীয় অর্থনীতিতে ও সমাজে এর অবদান বা ভূমিকা ইত্যাদি

২. পরিদর্শন পদ্ধতি

ক. পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ও আওতা
খ. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
গ. এগুলো শ্রেণীবন্ধকরণ ও উপস্থাপন
ঘ. পরিদর্শনকালীন সমস্যা

৩. তথ্য বিশ্লেষণ

এ অধ্যায়ে পরিদর্শনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ও সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন– ধরা যাক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। এর আলোকে নিচের বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হতে পারে।

ক. কী কী পণ্য উৎপাদিত হয়
খ. কোন বছর কী পরিমাণ উৎপাদিত হয়েছে
গ. পণ্যের কাঁচামাল কোথা হতে সংগৃহত হয়েছে
ঘ. কীভাবে পণ্য উৎপাদিত হয়েছে
ঙ. কীভাবে পণ্য বাজারজাত করা হয়
চ. উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কী কী সমস্যা হয় ইত্যাদি

৪. উপসংহার ও সুপারিশমালা

এ অধ্যায়ে পরিদর্শনকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, যেসব সমস্যা দেখা গেছে সেগুলো সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কী হতে পারে পরিদর্শক তাও সুপারিশের আকারে পেশ করে থাকেন।

নির্ঘণ্ট

প্রতিবেদনের এ অংশে উপাত্তের সারনি ও চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এর দুটি পদ্ধতি আছে। যথা :

ক. প্রতিবেদনের প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনার সাথে উপস্থাপন এবং
খ. প্রতিবেদনের শেষে পৃথকভাবে ক্রমিক নম্বরসহ উপস্থাপন
উভয় পদ্ধতিই স্বীকৃত। তবে শেষ বা প্রথমে যেখানেই উপস্থাপন করা হোক না কেন সংশ্লিষ্ট স্থানে এর রেফারেন্স থাকতে হবে।

গ্রন্থ বিবরণী

পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নকালে যেসব বইপুস্তক, সাময়িকী, গবেষণা গ্রন্থ, রিপোর্ট, জার্নাল, সরকারি প্রকাশনা, বার্ষিক বিবরণী ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্ণনা এ অংশে দেয়া হয়। গ্রন্থ বিবরণী প্রতিবেদনের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য

সাধারণ উদ্দেশ্য

ছাত্র–ছাত্রীদের সাথে নিয়ে ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্মসূচির সাধারণ উদ্দেশ্য হল ছাত্র–ছাত্রীদেরকে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা প্রদান করা। এতে ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১। ছাত্র–ছাত্রীদেরকে একটি ব্যবসায় বা শিল্পের পরিবেশ সচক্ষে দেখার ও কর্মকাণ্ড লক্ষ করার সুযোগ দান।

২। যারা ব্যবসায়কে জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের সাথে ছাত্র–ছাত্রীর পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান।

৩। ক্ষুদ্র ব্যবসায়/শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় ও শিল্পোদ্যোগীয় ভূমিকা কী সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দান।

৪। ছাত্র–ছাত্রীদেরকে আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সময় : একদিন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ব্যবসায়/শিল্প ইউনিট পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ।

ট্রেনিং সহায়ক

সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষকের পরিদর্শনের জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় ও শিল্প ইউনিট নির্বাচন করা উচিত। সে ইউনিট আত্মকর্মসংস্থানমূলক বা শিল্প ইউনিট হতে পারে।

করণীয়

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পূর্বে ছাত্র–শিক্ষকের নিম্নলিখিত কার্যপন্থাসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

– পরিদর্শনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে।

– ছাত্র/ছাত্রীদের ৪টি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপকে নিচে বর্ণিত যে কোন একটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন লিখতে বলতে হবে। অবশ্য ছাত্রসংখ্যা কম হলে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে নিচের বিষয়গুলোর উপর তথ্য সংগ্রহ করতে বলা যেতে পারে।

১। শিল্পোদ্যোক্তার গুণাবলি

২। উৎপাদন ও প্রশাসন সংক্রান্ত তথ্য

৩। বাজার সংক্রান্ত তথ্য

৪। প্রকল্প ব্যয়

৫। স্থায়ী পুঁজি, চলতি পুঁজি এবং অর্থসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য

শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবেন কিন্তু পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীরাই তথ্য সংগ্রহ করবে। পরিদর্শনের ১ দিন পর ছাত্র/ছাত্রীরা রিপোর্ট উপস্থাপন করবে। শিক্ষক প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য রাখবেন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য নিচে বর্ণিত প্রশ্নগুলো বিবেচনা করা দরকার।

১। ব্যবসায়টি কী সাফল্য অর্জন করেছে? যদি তাই হয় তাহলে সাফল্যের কারণ কী?

২। শিল্পোদ্যোক্তা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তা কীভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল।
৩। ব্যবসায় ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো কী কী? এগুলো কতটুকু কার্যকর?
৪। শিল্পোদ্যোক্তার কোন কোন গুণাবলি সাধারণ গুণাবলির আওতায় পড়ে?
৫। বাজার পরিবেশ কি সন্তোষজনক?
৬। পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কী? যদি থাকে তবে তা দূর করার উপায় কী?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতিবেদনের মধ্যে মূলত কোনটি থাকা উচিত?

ক. উদ্দেশ্য খ. নিজস্ব ধারণা
গ. সংজ্ঞা ঘ. পরিদর্শকের ব্যক্তিগত গুণাবলি

২. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হল –

i. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তব ধারণা লাভ
iii. ব্যবসায় যাদের পেশা তাদের সাথে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ লাভ
iii. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব কামাল চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করেন। বাস্তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

৩. পরিদর্শনের মাধ্যমে কী অর্জন করা যায় ?

ক. বাস্তব ধারণা খ. কর্মসংস্থান
গ. মালিকের সাথে সম্পর্ক ঘ. মালিকের সমর্থন

৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলে ছাত্রদের কী লাভ হয় ?

ক. আত্মসচেতনতা বাড়ে খ. সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে
গ. নিয়ম-শৃঙ্খলা বাড়ে ঘ. প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব রহিম কুমিল্লা জিলা স্কুলের ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যবসায় সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রদান করেন। বাস্তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, পদ্ধতি, অবস্থান, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ছাত্রদের নিয়ে তিনি একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

ক. পরিদর্শন কাকে বলে ?
খ. পরিদর্শনের ২টি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
গ. 'পরিদর্শন হল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ' —এর আলোকে পরিদর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পরিদর্শনের পূর্বের পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে বলে তোমার ধারণা ? এ সম্পর্কে মতামত দাও।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জী

১।	শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি	এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১৯৮৯
২।	শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন	এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা, ১৯৮৯
৩।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল	সামসুন নাহার ও অন্যান্য, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প, ফরিদপুর, ১৯৯২
৪।	আপনার ব্যবসায় কীভাবে শুরু করবেন	খাজা মঈনউদ্দিন, আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, বি, জি, ডি/১৫১/৮৫, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ঢাকা
৫।	হিসাব রক্ষণ	মোঃ মাহফুজুর রহমান, রচিত ও সম্পাদিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তব বোর্ড, ১৯৯৪, ঢাকা
৬।	উচ্চ-মাধ্যমিক হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান	কাজী ফারুকী ও অন্যান্য দ্বারা সম্পাদিত কাজী প্রকাশনী ও সৈকত প্রকাশনী ঢাকা, চট্টগ্রাম-১৯৯২
৭।	Starting and Managing Small Business	Kuriloft Arther H. & Others McGraw Hill Book Coppany, 1983
৮।	আধুনিক অর্থশাস্ত্র	আনিসুর রহমান, মার্চ, ১৯৮৭
৯।	শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা	ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী, জানুয়ারি, ১৯৮৭
১০।	শ্রম ও শিল্প আইন	অধ্যাপক এ, এ, খান, ১৯৮৮
১১।	কারবার সংগঠন	ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, নভেম্বর, ১৯৮৬
১২।	বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন	এম, এইচ, আলী, জানুয়ারি, ১৯৮৫
১৩।	অর্থ রোজগারের প্রচেষ্টা (আয়মূলক প্রকল্পের ইতিবৃত্ত)	ইকবাল মাহমুদ (প্যাক্ট এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৯২ সালে মুদ্রিত)
১৪।	Women Entrepreneurship in Bangladesh	Nilufer Ahmed karim ILO/BSCIC, Dhaka.

লেখক পরিচিতি

এ, এইচ, এম, হাবিবুর রহমান ১৯৩৯ সালের ৩০শে অক্টোবর কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি. কম. (অনার্স) ও এম. কম. পাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে তিনি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড থেকে শিল্প–অর্থায়ন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. রহমান ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন বাণিজ্য বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তিনি ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। অধ্যাপক রহমান শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে শিল্পোদ্যাগ কোর্স প্রচলন এবং পাঠ্যক্রম উন্নয়নে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে আসছেন। শিল্পোদ্যোগ বিষয়ের উপর তাঁর অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বি. কম (অনার্স) ও এম. কম. শ্রেণীর জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তকের একজন লেখক ও প্রধান সম্পাদক। তিনি দেশে বেশ কয়েকটি শিল্পোদ্যোগ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন ও পরিচালনা করেছেন। ড. রহমান শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন।

নিলুফার আহমেদ করিম ১৯৫৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আই. এ. পাস করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাস করেন। ১৯৮১ সালে তিনি গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সেখানে ম্যানেজমেন্ট কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত আছেন। নিলুফার করিম Project Feasibility, Project Management, Business Management, Management Conultancy, Training of Trainers for Entrepreneurship Development বিষয়ে দেশে ও বিদেশে (জাপান, আমেরিকা, ফিলিপাইন, ভারত) উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি আই এল ও, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফসহ বহু দেশি ও বিদেশি সংস্থা এবং এনজিওতে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়নে তিনি অগ্রণি ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন। তিনি বাংলাদেশ উইমেন এন্ট্রিপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েমন (উইএ) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদিকা।

–: সমাপ্ত : –